জিহাংহায় দস্যু বনহুর

রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

জিহাংহায় দস্যু বনহুর-৬৬

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

নীলাকে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চললো গোংলাইসিং সামনের দিকে। এখানে প্রবেশের সময় পথ সে ভালভাবে চিনে রেখেছিলো, তাই কোন অসুবিধা হয় না বেরিয়ে আসতে।

নীলা চোখ মেলে তাকাতেই ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। মৃতের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠে তার মুখমণ্ডল। দেখতে পায় সেই মুখ, সেই ভয়ঙ্কর দু'টি চোখ, লোলুপ কুৎসিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। নীলাকে চোখ মেলতে দেখেই হামবার্ট বলে উঠে—এবার সুন্দরী, কে তোমাকে রক্ষা করবে? কোথায় তোমার অহঙ্কারী পিতা, কোথায় তোমার রংলাল আর কোথায় তোমার হিতাকাঙ্খী দস্যু বনহুর? অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে শয়তানটা।

নীলার সংজ্ঞা ফিরে এসেছে, সে ভাবছে, এসব কি স্বপ্ন দেখছে! সে তো খেয়ে দেয়ে দিব্য আরামে তার বিছানায় ঘুমিয়েছিলো। এখন সে কোথায়? তবে কি দস্যু বনহুরের আস্তানা এটা নয়? আর দস্যু বনহুরের আস্তানাই যদি হবে এটা তাহলে নরপিশাচ হামবার্ট কি করে এখানে আসবে। বিস্ময় নিয়ে নীলা উঠে বসে বিছানায়, অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে চারদিকে।

হামবার্ট বুঝতে পারে নীলার মনে প্রশ্ন জাগছে সে কি করে এখানে এলো। তাই হামবার্ট বললো—মিস নীলা আমি বলেছিলাম যেমন করে হোক তোমাকে চাই। দেখলে আমার কথা সত্যি হলো কিনা। মনে রেখো, হামবার্ট যা বলে তা সে করে। যাদুমন্ত্রের দ্বারা আমি তোমাকে এই কান্দাই পর্বতের তলদেশে নিয়ে এসেছি।

এবার নীলা বুঝতে পারে সে এখন কোথায়। কান্দাই পর্বতমালার তলদেশে হামবার্টের কোন গোপন ঘাটিতে। শিউরে উঠে সে কারণ এবার তার রক্ষার কোনো উপায় নাই। কিন্তু হামবার্ট বলছে তাকে যাদু মন্ত্রের দ্বারা এখানে এনেছে। এটা কি সত্য না মিথ্যা।

নীলার সরল মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দেয় কিন্তু এসব বেশীক্ষণ ভাববার সময় পায় না। হামবার্ট দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসে। দু'চোখে তার

লালসা আর ক্ষুধার্ত শৃগালের দৃষ্টি। ভয়ঙ্কর একটা হিংস্র জীবের মত লাগছে তাকে। ক্রমে নীলার দিকে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে সে।

নীলা উঠে বসেছে, তাকাচ্ছে সে চারদিকে অসহায় চোখে।

হামবার্ট যত এগুচ্ছে নীলা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে।

ওপাশের দেয়ালে দপদপ করে একটা মশাল জ্বলছে, মশালের আলোতে হামবার্টের চোখ দুটো আগুনের গোলার মত লাগছে যেন। নীলার কণ্ঠ নালী শুকিয়ে গেছে। অসহ্য একটা যন্ত্রণা তার বুকের মধ্যে ঝড় তুলেছে। সমস্ত পৃথিবীটা তার চোখের সামনে দুলছে। নীলা ভীতভাবে চিৎকার করে উঠে—না না আমাকে তুমি স্পর্শ করোনা। না না না....

হামবার্ট হেসে উঠে তারপর হাসি থামিয়ে বলে—আজ আমি কোন কথা শুনবোনা। বহুদিন ধরে আমি তোমার প্রতিক্ষা করে আসছি, আজ তোমায় পেয়েছি। এমন কোন শক্তি নাই যে তোমাকে আজ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। নীলা তুমি আমার হৃদয়ের রাণী মেরী পিয়ারী এসো, এসো আমার বুকে এসো।

হামবার্ট ধরে ফেলে নীলাকে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে দস্যু বনহুর এসে দাঁড়ায়, ঠিক যেন মাটি ভেদ করে সে আবির্ভূত হলো। দাঁতে দাঁত পিষে কঠিন কণ্ঠে বললো হামবার্ট!

কে, দস্যু বনহুর তুমি!

হাঁ।

হামবার্ট নীলাকে মুক্ত করে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

দস্যু বনহুরের হাতে আজ মেশিনগান।

হামবার্টের চোখ দুটো প্রথমে বিস্ময়ে গোলাকার হয় তার পরে ক্রোধে ফেটে পড়ে যেন, বলে উঠে হামবার্ট—এই দুর্গম স্থানে তুমি কি করে এলে দস্যু?

যাদুমন্ত্রের দ্বারা তুমি যেমন নীলাকে এখানে নিয়ে এসেছো তেমন করেই আমি এখানে এসেছি। খবরদার একটু নড়লেই আমি ব্রাস ফায়ার করে তোমার দেহটাকে ঝাঁজরা করে দেবো।

হামবার্ট একটু পূর্বে তার দেহ থেকে রক্ষাবর্ম খুলে এই গুহায় প্রবেশ করেছিলো। রক্ষাবর্ম পরা থাকলে তার দেহে কোন আঘাত বা গুলি বিদ্ধ হয় না। হামবার্ট মনে করেছিলো এবার সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। গোংলাইসিং যখন নীলাকে এনে তার সম্মুখে হাজির করলো, তখন সে পারেনি গোংলাইকে

হত্যা করতে। নীলার সংজ্ঞাহীন দেহটা তার ক্ষুধিত মনে পাপ বাসনা জাগিয়ে তুলেছিলো। লালসায় সে অন্ধ হয়ে পড়েছিলো। হামবার্ট নীলার জন্য গোংলাইসিংকে খুলে দিয়েছিলো তার আংগুলের হীরক অংগুরী।

এই মুহূর্তে হামবার্ট শুধু বিস্মিতই হয়নি সে হতবাক হয়ে পড়েছে। এই অজানা দুর্গম স্থানে দস্যু বনহুর এলো কি করে, লোক চক্ষুর অন্তরালে, পর্বতমালার তলদেশে সে নিশ্চিত মনে তার প্রসার প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলো।

হামবার্ট হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েলো যেন, সে চিৎকার করে বললো—গোংলাইসিং একে পিছন থেকে বন্দী করে ফেলো।

হামবার্ট ভেবেছিলো বনহুর ফিরে তাকাবে পিছনে সে ঐ দণ্ডে আক্রমণ করবে তাকে পিছন থেকে কিন্তু বনহুর কঠিন কণ্ঠে বললো—গোংলাইসিং আর আসবেনা হামবার্ট। সে চির নিদ্রায় অচেতন।

হামবার্ট করতালি দিয়ে ডাকে—হার্ম হিসং রাজ...ফিরু...

বনহুর এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললো—কেউ ওরা আসবেনা শয়তান। সবাইকে আমি ঘুমিয়ে রেখে তোমার গুহায় প্রবেশ করেছি।

দস্যু বনহুর!

হাঁ হামবার্ট, তুমি এখন কান্দাই পর্বতমালার পাদদেশে শুধু একা, তোমার দলের একটি প্রাণীও জীবিত নাই।

হামবার্টের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

দস্যু বনহুর বললো—অবাক হচ্ছো শুনে তাই না? শোন হামবার্ট, তোমার সব প্রচেষ্টা সব সাধনা ব্যর্থ করে দিয়েছি প্রথম বার তুমি নিজে ধ্বংস করেছো তোমার জঙ্গল বাড়ি ঘাটি। দ্বিতীয় বার সব ধ্বংস করেছি আমি।

তুমি আমার সবকিছু বিনষ্ট করেছো?

হাঁ। আর একটু পরেই তুমি সব টের পেয়ে যাবে। তোমার রক্ত এবং চক্ষু রক্ষাগার আর তোমার হৃদপিণ্ড অপারেশন থিয়েটার সব ভষ্মিভূত হচ্ছে। একটু পরেই সেই অগ্নি কাণ্ডের লেলিহান শিখা এখানেও এসে পড়বে।

হামবার্ট শুষ্ক কণ্ঠে বলে উঠে—তুমি আগুন জ্বেলে দিয়েছো?

হাঁ, তোমাকেও আমি সেই আগুনে পুড়িয়ে মারবো হামবার্ট।

নীলা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখছিলো একবার দস্যু বনহুরের কালো আবরণে ঢাকা চোখ দুটোর দিকে একবার হামবার্টের ভয়ার্ত কুৎসিত

কদাকার ভয়ঙ্কর মুখখানার দিকে। এই মুহূর্তে নীলার কাছে দুস্য বনহুরকে অতি আপনজন বলে মনে হচ্ছে তার। তবুও সে পারছে না ওর পাশে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে।

হামবার্টের ঠিক সম্মুখে দাঁড়িয়ে দস্যু বনহুর। তার হাতে মেশিনগান। মেশিনগানের মুখটা হামবার্টের বুক লক্ষ্য করে ধরে আছে। যে কোন মুহূর্তে মেশিনগানের গুলি তার দেহকে ঝাঁজরা করে ফেলতে পারে।

হঠাৎ হামবার্ট তীর বেগে নীলাকে টেনে নেয় কাছে।

এতো দ্রত হামবার্ট নীলাকে টেনে নেয় যা দৃষ্টির পলকে হয়ে যায়। বনহুর মেশিনগান চালাতে পারেনা।

হামবার্ট নীলাকে সম্মুখে রেখে পিছু হটতে থাকে। মাত্র এক সেকেণ্ড, নীলাসহ হামবার্ট ঠিক দেয়ালের পাশে গিয়ে থেমে পড়ে।

বনহুর মেশিনগান সহ ঝাঁপিয়ে পড়ে হামবার্ট-এর উপর। কিন্তু বনহুরের ধাক্কায় নীলা পড়ে যায় মেঝেতে, হামবার্ট যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

নীলাকে যদি হামবার্ট হঠাৎ এ ভাবে টেনে না নিতো তাহলে বনহুরের হাত থেকে সে আজ পরিত্রাণ পেতো না কোন মতেই।

নীলাকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়।

নীলা কিংকর্তব্যবিমূঢ় য়ে পড়েছিলো, সে এখন কি করবে যেন ভেবে পায় না।

বনহুর বলে— মিস্ নীলা, আপনি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না কারণ হামবার্টের গোপন ঘাটিতে আমি আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। আর অল্প সময়ে সম্পূর্ণ ঘাটিতে আগুন ছড়িয়ে পড়বে।

নীলা বলে উঠে— কি করবো বলো দস্যু বনহুর? এখন আমি কি করবো?

আমার সঙ্গে আসুন। শয়তান হামবার্ট পালিয়েছে। এসে পুনরায় আক্রমণ চালাতে পারে। কাজেই আপনাকে যতক্ষণ নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম না হয়েছি ততক্ষণ আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন রয়েছি। আসুন আমার সঙ্গে।

নীলাকে সঙ্গে নিয়ে বনহুর বেরিয়ে আসে সেই স্থান থেকে একটি সুড়ঙ্গ পথে দ্রুত তারা এগিয়ে চলে।

বনহুর কিছুটা অগ্রসর হয়ে একটি গুহামধ্যে প্রবেশ করে।

নীলা বিস্ময় নিয়ে দেখে সেই গুহামধ্যে কতগুলো অর্দ্ধ উলঙ্গ নারী জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। সমস্ত গুহামধ্যে ধুম্ররাশি ছড়িয়ে পড়েছে। অল্পক্ষণেই এই অগ্নিকাণ্ড এই গুহা মধ্যেও এসে পড়বে।

নীলার মুখমণ্ডল লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠলো।

বনহুর ওদিক এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় সুইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে একটি দরজা বেরিয়ে এলো। বনহুর বললো— বোন, আপনারা এই পথে দ্রুত এগিয়ে যান, যেখানে সুড়ঙ্গমুখ শেষ হয়েছে সেখানে পৌঁছতে পারলেই আপনাদের মুক্তি, যান একদণ্ড বিলম্ব করবেন না।

যুবতীগণ তখন ভাব্বার সময় পেলো না, তারা দিশেহারার মত ছুটলো সেই সুড়ঙ্গ পথে।

বনহুর এবার নীলাসহ অপর একটি সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে চললো। সমস্ত পথ ধুম্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে দস্যু বনহুর আর নীলা। যদিও নীলার মনে একটা আতঙ্ক ভাব দানা বেঁধে উঠেছে, দস্যু বনহুর তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতি সে কিইবা আচরণ করবে কে জানে। এর চেয়ে তার মত্যু হলেও ভাল ছিলো। সেবার পিতা ছিলো বলে একটা সাহস ছিলো তার মনে, এবার সে একা নিঃসহায় নিঃসঙ্গ।

মন দুরু-দুরু করছে কিন্তু না গিয়ে কোন উপায় নাই। এই ভয়ঙ্কর দূর্গম স্থানে একমাত্র দস্যু বনহুরই যেন তার সহায়। তবু নীলা মনে প্রাণে খোদাকে স্মরণ করতে থাকে।

কিছুটা এগুতেই আর একটি গুহা দেখতে পেলো নীলা।

বনহুর সেই গুহায় প্রবেশ করলো।

নীলাও এলো তার পিছু পিছু।

এবার নীলার দু'চোখ গোলাকার হয়ে উঠলো, এ গুহায় দেখতে পেলো অনেকগুলো যুবককে দু'হাতে শিকল ঝুলিয়ে দেয়ালে আটকে রাখা হয়েছে। লোকগুলোর মধ্যে কেউ কেউ কঙ্কাল সার হয়ে পড়েছে।

বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খুলে দিতে লাগলো তাদের হাতের এবং পায়ের লৌহ শিকলগুলো।

নীলার চোখেমুখে বিস্ময়। দস্যু বনহুরের দেহে এতো শক্তি, যেন সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একা কুঠার জাতীয় জিনিসের আঘাতে শিকলের মুখ দু'খণ্ড করার পর সে নিজের হাতে টেনে খুলে ফেলতে লাগলো একটির পর একটি করে। অল্পক্ষণেই সকলে শিকল থেকে

মুক্ত হয়ে গেলো। বনহুর সবাইকে লক্ষ্য করে বললো— আপনারা যতশীঘ্র পারেন পালান। ঐ পথ দিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকুন। আর অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত গুহা গুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়বে। যান, শীঘ্র যান।

বন্দী যুবকগণ বনহুরকে দেখে যেমন অবাক হয়েছিলো তেমনি হতবাক হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের ভাববার সময় নেই, সবাই দিশেহারার মত ছুটতে লাগলো।

বনহুর এবার নীলাকে বললো— আসুন আমার সঙ্গে।

ঐ মুহূর্তে সমস্ত গুহায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

বনহুর নীলার হাত ধরে সামনের দিকে ছুটতে লাগলো হঠাৎ পথ রোধ করে দাঁড়ালো হামবার্ট। অজস্র ধূম্ররাশির মধ্যে গরিলা দৈত্যের মত মনে হচ্ছিলো হামবার্টকে। দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বের হচ্ছে। ওর হাত দু'খানায় দুটো রিভলভার।

বনহুর সঙ্গে সঙ্গে নীলাকে পিছন দিকে সরিয়ে সে সম্মুখে দাঁড়ায়, ভেবে নেয় সে কি করবে।

হামবার্ট গর্জন করে উঠে— এবার কোথায় পালাবে দস্যু! তোমার পথ বন্ধ। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

বনহুরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে হামবার্ট।

হামবার্টের গুলি তার রিভলভার থেকে বের হবার পূর্বেই বনহুর নীলাকে টেনে নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে সরে দাঁড়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে হামবার্টের উপর।

হামবার্ট টালসামলাতে না পেরে পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। হামবার্টের রিভলভার থেকে আরও দুটি গুলি বেরিয়ে যায়। চলে দস্তা ধস্তি ভীষণভাবে।

বনহুর দু'হাতে হামবার্টের রিভলভারসহ হাত দু'খানা চেপে ধরে, যাতে সে পুনরায় গুলি ছুড়তে না পারে। প্রচণ্ডভাবে লড়াই শুরু হয়।

নীলা অবাক চোখে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলো। ভয়ে দুঃর্ভাবনায় সে এতোটুকু হয়ে গেছে। ছোট বেলায় নীলার কিংকং বই-এর মধ্যে পড়েছিলো— কিংকং আর অদ্ভুত ভয়ঙ্কর একটা জীব তার পুতুল কন্যার জন্য যেমন যুদ্ধ করেছিলো, ঠিক দস্যু বনহুর আর হামবার্ট তাকে নিয়ে সেইভাবে যুদ্ধ করে চলেছে। কে পরাজিত হবে আর কে জিতবে কে জানে।

ততক্ষণে চারিদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

নীলা ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছে। কাউকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার কাছে দস্যু বনহুর যেমন তেমনি হামবার্ট। তবে দস্যু বনহুরকে সে কিছুটা বিশ্বাস করতে পারে কারণ সে কোন সময় তার উপর জোরপূর্বক কোন অনাচার বা অত্যাচার করেনি।

নীলা এখানে দস্যু বনহুরেরই জয় কামনা করছিলো।

বনহুর যখন হামবার্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো তখন সে মেশিনগান ফেলে দিয়েছিলো হাত থেকে কারণ বনহুর বুঝতে পেরেছিলো হামবার্ট তার পোশাকের নিচে রক্ষাবর্ম পরে এসেছে। বনহুরের মেশিনগানের গুলি তার শরীরে বিদ্ধ হবে না। তাই সে দৈহিক শক্তির দ্বারা এই নর-শয়তানকে কাবু করতে মনস্থ করেই আকমণ চালিয়েছে।

বনহুর একসময় হামবার্টের দক্ষিণ হস্তের রিভলভার খানা ছুড়ে ফেলে দিতে সক্ষম হয়। পা দিয়ে চেপে ধরে বাম হাতখানা। তখনও হামবার্টের বাম হাতে রিভলভারখানা রয়েছে।

হামবার্ট প্রাণপণে চেষ্টা করছে নিজকে দস্যু বনহুরের কবল থেকে রক্ষা করে নেবে। কিন্তু দস্যু বনহুরের সংগে পেরে উঠা কম কথা নয়।

এক সময় হামবার্টের বাম হাত থেকেও রিভলভারখানা খসে পড়লো।

বনহুর প্রচণ্ডভাবে দু'হাতে চেপে ধরলো হামবার্টের গলা। হামবার্টের চোখ দুটো যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে, সে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে শেষ চেষ্টা করলো নিজকে বাঁচিয়ে নেবার। দু'হাতে সে বনহুরের পাগড়ির অংশসহ জামার আস্তিন চেপে ধরলো। সংগে সংগে খসে পড়লো বনহুরের মাথা থেকে তার পাগড়িখানা।

নীলা বিস্ময়ভরা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো— রংলাল রংলাল তুমি

বনহুর মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ঠিক সেই ক্ষণে হামবার্ট বনহুরের হাত থেকে নিজকে বাঁচিয়ে নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়।

নীলা ঝাঁপিয়ে পড়ে বনহুরের বুকে রংলাল তুমি! মনির তুমিই দস্যু বনহুর?

কপালের এক জায়গা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো। বনহুর হাতের পিঠে কপালের রক্ত মুছতে মুছতে বলে— হাঁ। হাঁ নীলা।

সত্যি আমার কি আনন্দ হচ্ছে মনির...

নীলা এক সেকেণ্ড এখানে বিলম্ব করা উচিৎ নয়। চারিদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে তাছাড়া শয়তান হামবার্ট জীবন নিয়ে উধাও হয়েছে, এক্ষুণি পুনরায় সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারে।

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না তুমিই দস্যু বনহুর। কি যে খুশি লাগছে আমার.....

এসো নীলা সব পরে হবে।

বনহুর নীলার হাত ধরে ছুটতে থাকে।

চারিদিকে ধুম্ররাশি ছড়িয়ে পড়েছে। নীলাকে ধরে সাবধানে ছুটছে বনহুর।

কতবার পড়তে পড়তে বেঁচে যাচ্ছে নীলা।

এতো বিপদেও নীলার মনে অফুরন্ত আনন্দ উচ্ছ্বাস, ওর মনে হচ্ছে যুগ যুগ এমনি বনহুরের হাতে হাত রেখে সে যদি চলতে পারে তাতেও সে কোনদিন ক্লান্ত হবে না।

বনহুর বললো— নীলা আরও কিছুক্ষণ হবে। খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার.....

না কোন কষ্ট হচ্ছে না... তোমার পাওয়ার আনন্দে আমার সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে মনির....

দু'জনেই ছুটছে।

ধুম্ররাশিতে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে তাদের। চোখের সামনে জমাট অন্ধকার। তবু সামনের দিকে ছুটছে তারা।

এক সময় এক ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ ধুম্ররাশির মধ্যে ছুটছিলো তারা তাই চোখমুখ ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে পড়েছিলো। এখানে মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিলো বনহুর আর নীলা।

নীলা সচ্ছ দৃষ্টি মেলে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। হৃদয় ভরে সে দেখতে লাগলো ওর পৌরুষদীপ্ত মুখখানা।

নীলা বলে উঠলো— আমি তো স্বপ্ন দেখছিনা। সত্যি রংলাল তুমি, তুমিই দস্যু বনহুর।

রুমালে মুখ মুছে নিয়ে বলে বনহুর— যদি বিশ্বাস না কর তবে মিথ্যা....

হঠাৎ ঐ মুহূর্তে দূরে—অনেক দূরে পর্বতমালার পাদদেশে একটা অদ্ভুত মোটর গাড়ির মত কিছু নজরে পড়ে বনহুর আর নীলার। গাড়িখানা শব্দ বিহীন বলেই মনে হচ্ছে কারণ গাড়িখানা তখন দ্রুত চলছিলো তবু কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিলো না। গাড়ির সম্মুখভাগ ঠিক এরোপ্লেনের মত দেখতে।

নীলা বললো— আশ্চর্য এখানে গাড়ি এলো কি করে ভেবে পাচ্ছিনা?

বললো বনহুর— নিশ্চয়ই হামবার্টের বাহন ওটা।

গাড়িখানা চলতে চলতে হঠাৎ তার দু'পাশে দুটো পাখা বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়ে উঠে গাড়িখানা।

বনহুর আর নীলা তাকিয়ে দেখছিলো।

বনহুর বললো— হামবার্ট কান্দাই ছেড়ে পালিয়ে গেলো। নীলা আপাততঃ তোমরা পিতা পুত্রী নিশ্চিন্ত হলে।

অদ্ভুত গাড়িখানা তখন আকাশের উপরে অনেক দূর উঠে গেছে। ক্রমে মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়। বনহুর বলে নীলা চলো এবার তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

তোমার বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে তাই না?

ক্ষুধার চেয়ে পিপাসা বেশি কিন্তু এখানে কোথায় পাবে তুমি পানি, মনির?

বনহুর চারিদিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকায়।

পূর্ব দিক ফর্সা হয়ে এসেছে অল্পক্ষণের মধ্যেই সূর্য উদয় হবে।

বনহুর বললো— নীলা এখানে বসো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর; বেলা উঠলে পানি পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারবো।

নীলা ও বনহুর পাশাপাশি বসে পড়ে।

নীলা বলে— সত্যি আমার এতো খুশি লাগছে তোমাকে কি বলবো!

নীলা!

আচ্ছা এবার বলো তো তুমি হঠাৎ কেমন করে এই দুর্গম স্থানে আবির্ভূত হলে?

একটু হেসে বলে বনহুর— যাদু মন্ত্রের ফলে---

মিথ্যা কথা সত্যি করে বলো?

নীলা সবই খোদার ইচ্ছা। তুমি বিশ্বাস করো তাঁর ইচ্ছাতেই আমি তোমাকে নরপশু শয়তান হামবার্টের কবল থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি।

মনির তুমি যদি ঐ মুহূর্তে না এসে পৌঁছতেই তা হলে পাপিষ্ঠ আমার ----নীলা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে।

বনহুর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে— নীলা কেঁদো না!কি করে এখানে এলাম তোমাকে সব বলছি। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে বনহুর— শয়তান হামবার্টের অনুচরটি যখন তোমার ঘরে প্রবেশ করলো। তখন ওকে দেখতে পাই। প্রথমে আমি বুঝতে পরিনি, মনে করি সে আমাদেরই

লোক কোন কারণে তোমার কক্ষে যাচ্ছে মনে কেমন সন্দেহ জাগলো। আমি লোকটাকে অনুসরণ করলাম।

নীলা অবাক হয়ে শুনতে লাগলো বনহুরের কথাগুলো।

বনহুর বলে চলেছে— আমি লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলাম সে আমাদের লোক নয় আরও বুঝতে পারি শয়তান আমার কোন এক অনুচররের বেশে আমার আস্তানায় প্রবেশ করেছে।

নীলা বলে উঠে—তুমি তাকে চিনতে পেরেও কিছু বললো না।

তখন আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি।

তারপর ?

লোকটা কি করে আমি সব দেখতে লাগলাম। দেখলাম সে তোমার বিছানার পাশে এসে পকেট থেকে একটি রুমাল বের হরে তোমার নাকের কাছে ধরলো।

মনির তবু তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি।

না, কারণ আমি দেখতে চাই এর শেষ কোথায়? ইচ্ছা করলে ঐ দণ্ডে আমি বিড়ালের মত গলা টিপে হত্যা করতে পারতাম কিন্তু করলাম না। আমার উদ্দেশ্য তাকে অনুসরণ করা। দেখতে চাই সে তোমাকে কোথায় নিয়ে যায়।

শুষ্ক কণ্ঠে বলে নীলা—তারপর?

লোকটা যখন তোমার নাকের কাছে রুমাল নাড়ছিলো তখন তুমি একটু নড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লে। আমি বুঝতে পারলাম তুমি সংজ্ঞা হারালে।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার।

হাঁ নীলা সাংঘাতিকই বটে।

তারপর?

তারপর লোকটা এদিক ওদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। যদিও সে জানে কেউ তাকে বাধা দিতে আসবেনা। কারণ লোকটা আমার অনুচরের বেশে আমার আস্তানায় প্রবেশ করে আমার অনুচরের খাবার পানির সঙ্গে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিলো, বুঝতেই পারছে সে কেউ এখন জেগে নেই।

তুমি তাহলে সব জানতে।

হাঁ আমি অনুমানেই বুঝে নিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই আস্তানায় কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেছে, না হলে এভাবে সবাই নিদ্রায় অচেতন থাকতো না অন্ততঃপক্ষে প্রহরীগণ সমস্ত রাত জেগে থাকতো। আমি আড়াল থেকে

দেখলাম লোকটা তোমার সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিলো কাঁধে। আমি সেই ক্ষণে বেরিয়ে এলাম দ্রুত গতিতে একটা গাড়ি নিয়ে গলির মুখে অপেক্ষা করতে লাগলাম। জানতাম সে তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে আসবে।

অবাক হয়ে গেছে নীলা, দু'চোখ তার কপালে উঠেছে যেন, রংলাল নিজে তাকে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

বনহুর নীলার মনোভাব বুঝতে পারে একটু হেসে বলে— অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটা তোমাকে কাঁধে নিয়ে আমার গাড়ি খানার পাশে দাড়ালো। আমি যেন বসে বসে ঝিমুচ্ছি এমনি ভাব দেখালাম।

তারপর?

লোকটা আমাকে বললো— এই ড্রাইভার ভাঁড়ায় যাবে? আমি হাই তুলে তাকালাম। লোকটা বললো, আমার স্ত্রী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে... আমি ওকে বেশি বলবার সময় না দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলাম। লোকটা তোমাকে পিছন আসনে শুইয়ে দিয়ে নিয়ে উঠে বসলো, তারপর পথের নির্দেশ দিলো। আমি নির্দেশ মত গাড়ি চালিয়ে চললাম।

সত্যি তুমি এতো নির্দয় হতে পারলে?

নীলা প্রয়োজনে আমাকে এসব করতে হয়েছে। তুমি সব শুনলে বুঝতে পারবে। আর তখন আমাকে নির্দয় বলতে পারবে না। লোকটা আমাকে কোন রকম সন্দেহ না করে এজন্য আমি যথেষ্ট সাবধান তা অবলম্বন করলাম। আমার গাড়ি চলেছে। শহরের পথ ছেড়ে গ্রাম্য পথ তারপর সম্পূর্ণ এলো পাথারী পাহাড়িয়া পথ। অবশ্য মাঝে মাঝে আমি আপত্তি জানাচ্ছিলাম, সাহেব এসব পথে গাড়ি চালাতে পারবো না। লোকটা আমাকে মোটা বখশীসের লোভ দেখালো। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। বহুক্ষণ চলার পর এক জায়গায় এসে গাড়ি রাখলাম, সে জায়গা বেশি দূরে নয় --- বনহুর আংগুল দিয়ে অদূরে একটা জায়গা দেখালো ঐ— ওখানে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে। লোকটা তোমাকে গাড়ি থেকে তুলে নিলো কাঁধে।

তোমার বখশীস?

হাঁ তোমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পকেট থেকে এক গাদা নোট বের করে আমার হাতে দিলো। আমি তো টাকা পেয়ে আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠলাম। লোকটা তখন তোমাকে পেয়ে এতো বেশি খুশি হয়ে পড়েছে যে আর আমার দিকে লক্ষ্য করার সময় পেলো না। তোমাকে নিয়ে সে সোজা এই

পথ ধরে পর্বতের ভিতরে প্রবেশ করলো। আমিও গাড়িখানাকে ঝোঁপের আড়ালে রেখে তাকে অনুসরণ করলাম। সে একটিবার ফিরে তাকিয়ে দেখলো না। আমি শব্দ বিহীন ভাবে রিভলভার সঙ্গে নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছি। ইচ্ছা করলে তোমার বাহককে খতম করে তোমাকে অনেক পূর্বেই উদ্ধার করে নিতে পারতাম কিন্তু বুঝতেই পারছো আমার উদ্দেশ্য তোমাকে টোপ ফেলে শিকারকে পাকড়াও করা। হাঁ আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, হামবার্টের সমস্ত অনুচরকে আমি এক এক হত্যা করেছি। তার সমস্ত ঘাটি অগ্নি কুণ্ডে পরিণত করেছি। তোমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু একটা অনুতাপ হামবার্টকে হত্যা করতে পারলাম।

আশ্চর্য তোমার বুদ্ধিবল, আশ্চর্য তোমার কার্যকলাপ, আশ্চর্য তুমি মানুষ.....

তুমি যাই বলো তাই নীলা। এবার চলো দেখি কোথাও পানি পাই কিনা। তারপর রওয়ানা দেবো আমরা।

নীলা উঠে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে চারিদিকে সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে।

খান বাহাদুর আমির আলী ও নীলাকে তাদের বাসভবনে পৌছে দেয় বনহুর নিজে। আমির আলীর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠে। তিনি মনে মনে তার কু'কর্মের জন্য লজ্জিত হন। শুধু লজ্জিতই হন না তিনি অনুতপ্তও হন। তিনি তার গবেষণাগার বিনষ্ট করে ফেলেন এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন শুরু করেন। কিন্তু সমস্যা হলো নীলাকে নিয়ে। নীলা তো তার রংলালকে ছাড়া কিছুই বোঝেনা। যাকে নিয়ে নীলার মনে বিপুল আলোড়ন, সে তখন অনেক দূরে।

জিংহায় একটি ছোট্ট হোটেলে নির্জন কক্ষে বসে সিগারেট পান করে চলেছে। কিছুক্ষণ পূর্বে সে এই হোটেলে এসে উঠেছে।

জিংহায় সব চেয়ে ছোট এবং নিকৃষ্ট হোটেল পিউলপাং কুলি, মজুর আর গরিব জনগণই এই হোটেলের বাসিন্দা। বনহুর এখানে একজন শ্রমিকের বেশেই এসে উঠেছে। এ শহরটা চীন রাজ্যেরই একটি অংশ। জনবহুল শহর একেবারে ছবির মত না হলেও মনোরম বটে। প্রশস্ত রাস্তার দু'পাশে সাদা চূন কাম করা গগণ চুম্বি দালান কোঠা। আকাশ সহজে নজরে পড়ে না.

তবে ভালভাবে তাকালে ইলেকট্রিক তরের বেড়া জাল ভেদ করে দেখা যায় নীল আকাশের কিছু অংশ। রাতের বেলায় তাও দেখা যায় না, রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলোর অটোমেটিক আলোর ঝলকানি আর ধাবমান গাড়িগুলোর হেড লাইটের তীব্র আলো দুচোখে ধাধা লাগিয়ে দেয়।

হোটেল পিউলপাং শহরের সর্বনিম্ন অঞ্চলেই অবস্থিত। এদিকে সুউচ্চ সাদা সাদা দালান কোঠাগুলোর সারি কম তবে কাঠ আর তক্তার দোতালাগুলো বেশি। নানারকম কারুকার্য খচিত তক্তা দিয়ে সুন্দর করে ঘরগুলো তৈরি করা হয়েছে। কোন কোন বাড়ি বা দোকানের তক্তায় নানা রকম রং-এর আঁচড়। তবে বেশির ভাগ জীব-জন্তুর ছবিই নজরে পড়ে।

জিংহায় লোকজনের চেহারা চীনাদের মতই কিন্তু এরা কিছুটা লম্বাটে। অত্যন্ত পরিশ্রমী আর কর্মঠ এরা, সব সময় কাজ নিয়েই মেতে থাকতে ভালবাসে।

পিউলপাং হোটেলের সম্মুখ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেটা পিচ-ঢালা মসৃণ নয়, লাল কাঁকড় বিছানো পথ। তাই এ পথে সৌখিন গাড়ি বড় একটা নজরে পড়ে না। শুধু মালবাহী বড় বড় ট্রাকগুলো এ পথে যাওয়া আসা করে। এসব গাড়িগুলো যখন চলে যায় বা আসে তখন রাশিকৃত ধূলো লাল ধোঁয়ার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই পথের ধারের বাড়ি ঘর এবং দোকানগুলোর দেহ তাই লালচে পান খেকোর দাঁতের মত কতকটা।

হোটেল পিউলপাং এর যে জায়গাটায় বসে দস্যু বনহুর সিগারেট পান করছিলো সে জায়গা থেকে পথটার কিছু অংশ স্পষ্ট নজরে আসে।

বনহুরের পাশের টেবিলে বসে কয়েকজন চীনা শ্রমিক কফিপান করছিলো এবং তারা চীনা ভাষায় নানা রকম আলাপ আলোচনা করছিলো। বনহুরের চীনা ভাষা ভাল জানা না থাকলেও সে একটু আধটু বলতে এবং বুঝতে পারতো। বনহুরের দৃষ্টি বাইরের পথটার দিকে থাকলেও কান তার সজাগ ছিলো শ্রমিকগণ কি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে এটাই সে মনোযোগ সহকারে শুনছিলো।

বনহুর হঠাৎ চমকে উঠলো, কে যেন তার কাঁদে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফিরে তাকালো সে ধীরে ধীরে, আশ্চর্য না হলেও কিছুটা বিস্মিত হলো বনহুর। একটি তরুণী তার কাঁধে হাত রেখে দিব্য দাঁড়িয়ে আছে। মৃদু মৃদু হাসছে তরুণী, তার চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্ত।

বনহুরকে ফিরে তাকাতে দেখে তরুণী ইংরেজিতে বললো— তুমি বুঝি নতুন লোক?

বনহুর ইংরেজিতে উত্তর দিলো— হাঁ নতুন এসেছি জিংহায় তুমি কে জানতে পারি কি?

বনহুর কথায় মেয়েটা হেসে বললো— এখানকার সবাই আমাকে চিনে? তুমি নতুন বলেই আমাকে চিনতে পারছো না। আমি এই হোটেলের মালিকের মেয়ে।

অনেকটা সচ্ছ হয়ে আসে বনহুর, কারণ মেয়েটা আচমকা তার কাধে হাত রাখায় কিছুটা বিব্রত বোধ করছিলো সে, যেহেতু মেয়েটি তার সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

বনহুর মেয়েটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ম নজরে দেখে নিলো। শরীরে আট সাট পোশাক, প্যান্ট, হাওয়াইসার্ট, মাথায় ক্যাপ, গলায় টাই ও পায়ে জুতো। এবার বনহুর ওকে লক্ষ্য করে বললো— তোমাকে মেয়ে বলে মনেই হয় না, যা হোক এবার বলোতো তোমার নাম কি?

তরুণী স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলো—আমার নাম হুংমা।

বনহুর তরুণীর নামটা একবার উচ্চারণ করলো—হুংমা।

হাসলো তরুণী।

বনহুর তাকালো ওর মুখের দিকে।

তরুণী বললো—তুমি কি এই হোটেলে থাকতে চাও?

হাঁ।

বেশ এসো আমার সঙ্গে তোমার জন্য বাবাকে বলবো।

চলো, দেখো আমার কোন অসুবিধা না হয়।

না না, তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

বনহুর তার সুটকেসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

তরুণী বলে—এসো আমার সঙ্গে।

হোটেল পিউলপাং সম্পূর্ণ তক্তা এবং কাঠ দিয়ে তৈরি। হোটেলের সিড়িগুলোও মোটা তক্তার। বনহুর আর হুংমা সিড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে।

নিচে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, উপরে থাকার ঘর। বড় বড় দুটো কক্ষ। এক একটা কক্ষে প্রায় বিশখানা বেড রয়েছে। বড় ঘর দু'খানার মাঝখানে সিড়িঘর, সিড়িঘর খানার পাশেই হোটেলের মালিক হুংমার বাবার বসবার ঘর।

বনহুর সহ হুংমা কক্ষে প্রবেশ করেই ডাকলো— বাবা নতুন লোক এসেছে। আমাদের হোটেলেই থাকবে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো ওপাশে হাতলভাঙ্গা একটা চেয়ারে বসে আছে বিশাল দেহী একটা লোক। অবশ্য বেশি লম্বা নয় শুধু প্রশস্ত দেহ, চোখ দুটো অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এক জোড়া গোফ নাকের নিচে কাঠবিড়ালীর লেজের মত ঝুলে আছে।

শরীরে একটা ফতুয়া আর তহবন।

মাথার উপরে বন বন করে একটা ফ্যান ঘুরছে তবু লোকটার ফতুয়া ঘেমে চুপসে গেছে।

ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো তুলে বনহুরকে দেখে নেয়, তারপর বলে হুংমার বাবা— তোমাকে তো জিংহার লোক বলে মনে হচ্ছে না।

বনহুর বলে— আমি জিংহাবাসী নই।

তবে কোথা থেকে এসেছো? বললো আবার হুংমার বাবা।

বনহুর জবাব দিলো, ঝাঁম শহর থেকে এসেছি।

ঝাঁম শহর?

হাঁ।

একটু কিছু ভেবে নিয়ে বললো— ঝাঁম শহর থেকে জিংহায় এসেছো, এতো দূরে কি কাজ তোমার?

বনহুর ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দ্রুত চিন্তা করে বললো— আমার বড় ভাই হারিয়ে গেছে তারই খোঁজে এসেছি।

বললো হুংমার বাবা—হুঁ। তা কত টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়ে এসেছো?

বেশি নয়।

তবে কি করে হোটেলে থাকা খাওয়ার খরচ জোগাবে?

সে আমি চালিয়ে নিতে পারবো।

তবু কেমন করে চালাবে শুনতে হবে তো? জানতো আমার হোটেলের পয়সা লাগে কম কিন্তু আমি বাকি বকেয়ার ধার ধারিনা।

বাকি আমি করবোনা কিছু, সব নগদ দেবো।

পাবে কোথায়?

কাজ করবো।

কাজ করবে?

হাঁ।

কি কাজ করতে পারো তুমি?

যে কাজ পাবো সেই কাজই আমি করতে পারবো।

বেশ তাহলে কোনো অসুবিধা হবেনা। খাতাটা সামনের টেবিলে মেলে ধরে বললো হুংমার বাবা— বলো তোমার নাম কি?

নাম?

হাঁ।

নাম আমার রাজা।

খিল খিল করে হেসে উঠলো হুংমা সে এতোক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো বাপ এবং লোকটার কথাগুলো। এবার রাজা নামটা শুনে সে হেসে উঠলো।

বনহুর তাকালো হুংমার মুখের দিকে।

ওর বাবা বললো— রাজা তোমার নাম তোমার বাবার নাম কি?

বাবার নাম আমি জানিনা।

সে কি নিজের বাবার নাম জানোনা তুমি? অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো হুংমা।

ওর বাবা বলে উঠলো—অনেক ক্ষেত্রে বাবার নাম জানা থাকে না বুঝলে হুংমা।

সেকি রকম বাবা?

যেমন ধরো ছোট বেলায় যে হারিয়ে যায় সে তার বাবার নাম কেমন করে জানবে। যেমন ধরো আমি আজও আমার বাবার নাম জানিনা।

হুংমা বলে উঠে — তুমি তোমার বাবার নাম জানোনা?

না মা।

আশ্চর্য বটে। কথাটা টেনে টেনে উচ্চারণ করলো হুংমা।

বনহুর বললো— তেমনি আমিও হারিয়ে গেছি খুব ছোট বেলায় তাই বাবার নাম জানি না।

বেশ তোমার নাম আর দেশের ঠিকানা লিখে রাখলেই চলবে। যাও হুংমা ওকে ওর বিছানা দেখিয়ে দাওগে। হাঁ মনে রেখো আমি কিন্তু বাকি বকেয়া কাজ করিনা।

হেসে বললো বনহুর— না না, বাকি বকেয়া আমিও রাখিনা।

হুংমা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলো, থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে পিতার দিকে তাকিয়ে বললো— বাবা একে দেখে মনে হচ্ছেনা ফাঁকি দেবে। তাছাড়া আমার চোখকেও ফাঁকি দিতে পারবে না।

বনহুরও হুংমার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, সেও হুংমার বাবার মুখে তাকিয়ে দেখে নিলো এবং একটু হাসলো।

হুংমা এগুলো—চলো।

তক্তার লম্বা বারেন্দা বেয়ে একটা ঘরে প্রবেশ করলো হুংমা। বনহুরও তার পিছনে পিছনে প্রবেশ করলো ঘর খানার মধ্যে।

ঘরের মেঝেতে দু সারি তক্তার চৌকি পাতা। প্রত্যেকটা চৌকির উপর একটি কম্বল আর একটি বালিশ রয়েছে। এক একটা চৌকির পাশে এক একটা ছোট্ট টেবিল। টেবিলে চৌকির মালিকদের সামান্য যা জিনিস তা সাজানো থাকে।

একটি চৌকি দেখিয়ে বললো হুংমা— তুমি ঐ এক কোণের চৌকিটা পাচ্ছো।

হেসে বললো বনহুর— ভাল।

হুংমা আবার বললো— তোমার জন্য মাঝের একা চৌকি দিতাম কিন্তু এ সবগুলো রিজার্ভ হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছো প্রত্যেকটা টেবিলে আগন্তুকদের জিনিসপত্র।

হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি। বনহুর কথাটা বলে ওদিকের শূন্য চৌকিটার উপরে তার সুটকেসটা রেখে বসে পড়লো।

হুংমা বললো— তোমার চৌকির কম্বল আর বালিশ এক্ষুণি পেয়ে যাবে।

বেশ আমি বিশ্রাম করে নি।

তোমাকে দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

হাঁ, আমি ক্লান্ত বটে। কম্বল এবং বালিশটা পেলে আমি এক চোট ঘুমিয়ে নেবো।

একটু হেসে বেরিয়ে গেলো হুংমা।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো, জিংহা তার কাছে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা দেশ। এখানের মানুষ সম্বন্ধে তার কোন রকম ধারণা নেই। না জানি জিংহায় তার কেমন কাটবে। যদিও বনহুর ইচ্ছা করলে জিংহার বড় কোন হোটেলে উঠতে পারতো কিন্তু সে তা করিনি। কারণ সে চায় জিংহার আসল রূপ উদঘাটন করতে এবং সে জন্যই বনহুর বেছে নিয়েছে জিংহার সব চাইতে নিকৃষ্ট হোটেল পিউলপাং। কুলি, মজুর, শ্রমিকদের মধ্যে ডুব দিয়ে সে জানতে চায় তাদের জীবন যাত্রা কোন স্তরের। দোতালার মানুষ আর নিচ তলার মানুষের মধ্যে কতখানি তফাৎ। এ দেশে যদিও তার

উদ্দেশ্য হামবার্টকে খুঁজে বের করা। এই হোটেলখানা তার কাছে মন্দ লাগছে না, এখানে নানা ধরনের মানুষ আনা-গোনা হয়। হোটেলের মালিককে মোটামুটি বিশ্বাস করা যায়, যদিও তার চোখ দুটো শিয়ালের চোখের মত ধূর্তমিতে ভরা। মেয়েটা ভাল এবং সাদা-সিদে হতে পারে তবে....

বনহুরের চিন্তা ধারা এলো মেলো হয়ে যায়। হুংমা বগলে একটা বালিশ আর কম্বল নিয়ে হাজির হয়। বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে— এই নাও তোমার কম্বল আর বালিশ। হাঁ ঘুমিয়ে নাও খুব করে।

বনহুর বললো— কিন্তু পেট যে আমার খিদেয় চোঁ চোঁ করছে।

বেশ তো নিচে যেয়ে খেয়ে এসো।

কিন্তু পা যে আমার নামছে না।

মানে?

মানে, পাদুটো অবশ হয়ে গেছে।

বেশ টাকা দাও, আমি তোমার খাবার এনে দিচ্ছি।

সত্যি হুংমা তুমি আমার খাবার উপরে এনে দেবে?

বাঃ তুমি যে বললে তোমার পা নামছে না?

হাঁ, পাদুটো একেবারে..

বুঝছি, বসো আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি। ঐ যে ওদিকে যে দরজা দেখছো ওটা বাথরুম, ওখান থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসোগে। দাও টাকা দাও।

বনহুর পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে হুংমার হাতে দেয়।

হুংমা চলে যায়।

বনহুর উঠে দাঁড়ায়। শরীরটা তার বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো কারণ কান্দাই থেকে জিংহা শুধু হাজার হাজার মাইলই দূরে নয় মাঝখানে কয়েকটা পাহাড় পর্বত এবং সাগরও রয়েছে। শুধু প্লেনেই সে আসেনি জাহাজেও তাকে আসতে হয়েছে ক'দিন। বাথ রুমে প্রবেশ করে হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসে।

এমন সময় ফিরে আসে হুংমা, হাতে তার খাবারের থালা।

বনহুর হাত মুখ না মুছেই টেবিলে বসে পড়ে।

হুংমা খাবারের থালাটা টেবিলে রাখতেই বনহুর গোগ্রাসে খেতে শুরু করে।

হুংমা কতটা অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। ভাবছিলো লোকটা তো কম নয়, তার হাত থেকে থালা রাখতে না রাখতে কেমন তাড়া হুড়ো করে খেতে শুরু করে দিলো। হুংমা পকেট থেকে বাকি টাকাগুলো বের করে বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরলো —তোমার টাকা নাও।

বনহুর খেতে খেতে জবাব দিলো— ও গুলো তোমার কাছে রেখে দাও।

কেনো, তুমি নেবেনা?

না।

সেকি?

কিছু না, তুমি যাও।

হুংমার চোখ দু'টো আনন্দ দীপ্ত হয়ে উঠলো, সে দু'ঠোঁটের ফাঁকে আংগুল রেখে আনন্দ সূচক শব্দ করে উঠলো তারপর সিড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেলো নিচে।

বনহুর খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লো তার নিকৃষ্ট বিছানায় লম্বা হয়ে। জুতো জোড়া পায়েই রইলো নাক ডাকা শুরু হলো ওর।

সবে মাত্র ঘুমটা জমে উঠেছে এমন সময় কয়েকজন শ্রমিক উঠে আসে উপরে।

হঠাৎ একজনের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বনহুরের উপর। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকটা আংগুল দিয়ে সঙ্গীদের দৃষ্টি বনহুরের দিকে আকর্ষণ করে। সবাই এগিয়ে যায় ওর বিছানার পাশে, অবাক চোখে দেখতে থাকে বনহুরকে। নতুন এক আগন্তুককে তাদের আস্তানায় দেখতে পেয়ে রাগে হিংসায় জ্বলে উঠে ওদের মন। যে শ্রমিকটা সবার আগে এগিয়ে গিয়েছিলো, সে সঙ্গে সঙ্গে ওর নাকে মুখে চালায় ঘুষির পর ঘুষি।

বনহুর আচমকা এমন অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলোনা। তাও সে ঘুমের ঘোরে অচেতন সেই সময় এই ঘটনা। বনহুর কয়েক মিনিটেই টাল সামলে নিলো তারপর সে পাল্টা ঘুষি চালাতে শুরু করলো দুমা-দুম, দুমা-দুম--- দু'চার মিনিটের মধ্যেই শ্রমিকগণ কে কোন দিকে পালাবে তার পথ পেলোনা। কারো বা দাঁত ভাংলো, কারোও বা নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো, কারো বা কপাল কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

কক্ষটা সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেলো।

বনহুর এবার জামার আস্তিন মেলে দিতে দিতে বিছানায় বসে পড়লো। ভাবলো এবার হোটেলের মালিক সহ ওরা এসে হাজির হবে তার কাছে, নানারকম কৈফিয়ৎ তলব করে বসবে।

কিন্তু বেশ কিছু সময় কেটে গেলো কেউ এলোনা। মালিক বা শ্রমিকগণ কারো পাত্তা নেই। বনহুর আবার শুয়ে পড়লো বিছানায়। কিন্তু প্রথম বারের মত এবার চট্ করে ঘুম এলোনা তার চোখে।

তারপর হঠাৎ যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই বনহুরের। ঘুম ভাংতেই চোখ মেলে তাকালো, ভোর হয়ে গেছে কখন। হাই তুলে বিছানায় উঠে বসে তাকালো কক্ষ মধ্যে। সে অবাক হয়ে দেখলো যার যার বিছানায় সে সে শুয়ে আছে সবাই ঘুমে অচেতন।

বনহুর ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো।

বনহুর অনুমানেই বুঝে নিয়েছে শ্রমিকগণ তার কাছে মার খেয়ে নিশ্চয়ই মালিকের কাছে গিয়েছিলো— নালিশ জানিয়েছিলো তার কাছে কিন্তু তাদের সব শুনে মালিক নিশ্চয়ই ওদের খুব করে বকে দিয়েছে যার জন্য ওরা নীরবে এসে যার যে জায়গা দখল করে নিয়ে শুয়ে পড়েছে।

পরদিন।

বনহুর লক্ষ্য করলো শ্রমিকরা সবাই যেন বনহুরকে কেমন সমীহ করে চলছে। হয়তো বনহুরের কাছে গতরাতে মার খেয়ে ওরা সোজা হয়ে গেছে।

আর হবেই না বা কেনো, কম মার খায়নি ওরা বনহুরের কাছে। এখনও ওদের চোখ মুখ চোয়ালগুলো ফুলে ফুলে আছে। কম কি ব্যথা, সমস্ত রাত ওরা ভাল করে ঘুমোতে পর্যন্ত পারেনি।

শ্রমিকদের সর্দার ভেবেছিলো এ লোকটা আবার কে? চেহারা দেখেই ওরা বুঝতে পেরেছিলো— সে এদেশের বাসিন্দা নয়, তাই ওরা বনহুরকে ঘুমন্ত অবস্থায় মারতে শুরু করে দিয়েছিলো। ওরা জানতো না ওর গায়ে কেমন শক্তি। টের পেয়ে গেলো একটু পরেই। সে কি ভীষণ আঘাত শ্রমিকরা মার খেয়ে পালানোর পথ পেলো না। গিয়েই নালিশ জানালো হুংমার বাবার কাছে ,সব কথা ওরা বললো— যার যা মুখে এলো সেইভাবে।

হুংমার বাবা সব শুনে অবাক হলো, বললো— তোমাদের মতই সেও আমার হোটেল বাসিন্দা কাজেই তোমাদের মতই তারও অধিকার আছে এ হোটেলে।

তখন মুখ চুন করে সবাই সরে গিয়েছিলো অবশ্য তারা দল বেঁধে পরামর্শও করেছিলো ওকে কেমন করে জব্দ করবে। তারা কিন্তু অনেক শলা-পরামর্শ করেও কারো সাহসে কুলালো না ওকে জব্দ করবে কেমন করে।

একজন নাম তার চিংচু, লোকটা বয়সে কম হলেও বুদ্ধি ভাল রাখে সেই বলেছিলো, ওকে জব্দ করে কাবু করার চেয়ে ওর সঙ্গে মিল লাগানো অনেক ভাল।

অপর একজন বলেছিলো— কেনো ওর সঙ্গে মিল লাগাতে হবে?

বলেছিলো চিংচু.... ওমন একজন হিম্মৎওয়ালা লোক আমাদের দলে থাকা অনেক ভাল। দেখলে তো এক সঙ্গে কতগুলো লোককে সে একাই কাবু করে ফেললো।

চিংচুর কথাগুলো মিথ্যা নয়, ভেবে দেখছিলো ওরা এবং সেই কারণেই ওরা সবাই মনোস্থির করে ফেলেছিলো যেমন করে হোক ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে।

বনহুর যখন নীচে টেবিলে খাচ্ছিলো তখন শ্রমিকদের সর্দার এসে বসলো ঐ টেবিলে।

বনহুর খেতে খেতে আড় নজরে তাকিয়ে দেখলো লোকটার চ্যাপ্টা নাকটা এখনও ফুলে আছে। ঠোঁটের একপাশে কালো জখম, কপালের মাঝখানে তুলো লাগানো রয়েছে এখনও। মুখ টিপে একটু হাসলো বনহুর, সে জানে তারই মুষ্ঠিঘাতে ওর এ অবস্থা।

অদূরে টেবিলে আরও কয়েকজন ফিস ফিস করে কি সব কথাবার্তা বলছে। ওদের চোখে মুখেও গত রাতের বনহুরের কাছে পাওয়া উত্তম মধ্যমের চিহ্ন।

বনহুর নীরবে খাবার খাচ্ছিলো।

লোকটা তার পাশে বসায় বনহুর আন্দাজ করে নিলো ওরা আজ আবার তার উপর আক্রমণ চালাবে। লোকটা বয়ের কাছে খাবারের অর্ডার দিলো।

খাবার এলো।

দুটো মুরগীর রোষ্ট এনে রাখলো বয়টা।

বনহুর মনে করলো তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে লোকটা ঐ মুরগীর রোষ্ট দুটো খাবে। শক্তিতে পারেনি তাই দুটো মুরগীর রোষ্ট এক সঙ্গে খেয়ে নিজের শক্তির পরিচয় দেবে। কিন্তু পরক্ষণেই বনহুরের ভুল ভাংলো।

লোকটা মুরগীর রোষ্টসহ একটা প্লেট এগিয়ে দিলো বনহুরের দিকে—বন্ধু এটা তুমি খাও।

অবাক হয়ে চোখ তুললো বনহুর।

লোকটা হেসে বললো—তোমার সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব করতে চাই।

প্রথমে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে। পরক্ষণেই অবশ্য তার ভুল ভাংলো, লোকটা মাংসের রোষ্ট খানা সত্যি সত্যি তুলে দিলো বনহুরের থালায়, বললো— খাও। তুমি খেলে আমরা সবাই খুশি হবো।

ততক্ষণে ওরা সবাই এসে দাঁড়িয়েছে বনহুরের টেবিলটার চারপাশে। ওরা সবাই বলে উঠলো— হাঁ, তুমি খেলে আমরা সবাই খুশি হবো।

বনহুর বললো— ধন্যবাদ, এমনি তোমরা আমার বন্ধু হলে। এটা আমি খেতে পারবো না কারণ খাওয়া আমার শেষ হয়ে গেছে। থালাটা সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো সে।

সর্দার প্রথমে বনহুরের হাতে হাত মিলালো।

পরে সবাই এক এক করে হাত মিলালো ওর সঙ্গে।

সবারই যখন হাত মিলানো শেষ হয়ে গেছে তখন হুংমা এগিয়ে এলো—তুমি আমারও বন্ধু।

বনহুর ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই হুংমা দ্রুত হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করলো ওর সঙ্গে।

এমন সময় একটি গাড়ি এসে থামলো হোটেল পিউলপাং এর সম্মুখে।

গাড়ি থামতেই গাড়ি থেকে নেমে এলো একটি লোক। সমস্ত শরীর তার মনি মুক্তা খচিত পোশাক পরিচ্ছদ। লোকটা হোটেলের দরজায় দাঁড়াতেই সমস্ত শ্রমিক মজুরের দল ভয় বিহ্বল হয়ে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলো।

লোকটা চীনা ভাষায় কি সব বললো তারপর বেরিয়ে গেলো।

বনহুর লক্ষ্য করেছিলো যতক্ষণ লোকটা হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলো ততক্ষণ হোটেলস্থ সবার মুখ ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলো।

লোকটা চলে যেতেই হোটেলস্থ শ্রমিকগণের মুখমণ্ডল স্বাভাবিক হলো।

বনহুর শ্রমিকদের সর্দারকে লক্ষ্য করে বললো— এই লোকটা কে?

শ্রমিকদের সর্দার কপালের ঘাম মুছে ফেলে বললো— চীনা দুস্যু হামবার্টের নাম শুনেছো? এ তারই প্রধান সহকারী ফাংফা।

মুহূর্তে বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন। আপন মনেই বলে উঠলো চীনা দস্যু হামবার্ট।

শ্রমিক সর্দার বললো— হাঁ, চীনা দুস্য হামবার্ট। শুধু দস্যুতাই সে করে না তার নানা রকম ব্যবসাও আছে।

জানি চোখের আর রক্তের ব্যব্সা...

তুমি নতুন মানুষ হয়ে হামবার্টকে চিনলে কি করে?

আমিও যে এক সময় হামবার্টের সঙ্গে ব্যবসা করতাম।

সবার চোখে একটা আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠলো, এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলো।

বনহুর বললো— কোন ভয় বা দুঃচিন্তার কারণ নেই তোমাদের। আমি এখন আর হামবার্টের সঙ্গে ব্যবসা করি না। তাছাড়া আমার শুধু পরিচয় হামবার্টের সঙ্গে, তার সহকারী বা সহচরদের সঙ্গে আমার তেমন কোন জানাশোনা নাই।

সেদিনের পর থেকে বনহুরের সঙ্গে পিউলপাং হোটেলের শ্রমিকদের গভীর একটা বন্ধুত্ব জমে গেলো। বনহুরের শক্তির পরিচয় তাদের জানা হয়ে গিয়েছিলো তাই তারা সবাই ওকে মেনে চলতো।

শ্রমিকরা যখন কাজে বের হতো তখন বনহুরও তাদের সঙ্গে যেতো। কাজ শেষে এক সঙ্গে ফিরে আসতো তারা সবাই মিলে।

মিলে মিশে ওরা হই হুলোড় করে খাওয়া-দাওয়া করতো। হুংমা নিজে বনহুরের জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতো, কোন কোন দিন সে নিজেও না খেয়ে প্রতিক্ষা করতো।

এক সপ্তাহ কেটে গেলো তারপর দু'সপ্তাহ গড়িয়ে চললো। বনহুর প্রথম প্রথম হুংমার আচরণে তেমন কিছু মনে করতো না। কিন্তু পরপর সে বুঝতে পারলো, হুংমাও খান বাহাদুর আমির আলীর মেয়ে নীলার মত তার প্রতি অনুরাগীনী হয়ে পড়েছে। বনহুর যতদূর সম্ভব ওকে এড়িয়ে চলতো। রাতে যখন সে শুইতে যেতো তখন চুপি চুপি পা টিপে টিপে নিজের বিছানার দিকে এগুতো। তবু কোথায়? হুংমা যে সজাগ হয়ে থাকতো। বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়াতো সে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলতো— এতোক্ষণ কোথায় ছিলে রাজা?

বনহুর এ হোটেলে রাজা নামেই পরিচিত হয়ে গেছে। হোটেলের মালিক হুংমার বাবা চাচুচিং থেকে শুরু করে হোটেলের বয় পর্যন্ত তাকে ঐ নামে ডাকে।

বনহুর এতে খুশি হয়।

হুংমা যখন তাকে প্রশ্ন করে বসলো, এতোক্ষণ কোথায় ছিলে রাজা? তখন একটা প্রচণ্ড রাগ তার মনে তোলপাড় জাগালো। সে এতোক্ষণ কোথায় ছিলো না ছিলো এর কৈফিয়ৎ হুংমাকে দিতে হবে কেন? কি তার অধিকার তাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করার।

হুংমা পথ আগলে দাঁড়ালো— কোথায় গিয়েছিলে, বলবে না রাজা?

রাজা ওর পাশ কেটে ততক্ষণে নিজের চৌকির উপর গিয়ে বসেছে। সে উবু হয়ে পা থেকে জুতো জোড়া খুলতে লাগলো।

হুংমা মাথার ক্যাপটা খুলে বগলে রেখে অভিমানের স্বরে বললো— বেশ বলবে না তো আমি আর কোন কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো না।

ওপাশের বিছানায় শুয়ে শুয়ে জবাব দিলো চিংচু—হুংমা তুমি বড্ড বেশি কথা বলো। দেখছো না রাজা পরিশ্রম করে কেমন ক্লান্ত হয়ে এসেছে। একটু বিশ্রাম করতে দাও।

অপর বিছানা থেকে মাংতুচিং বলে উঠলো—হুংমা রাজাকে ভালবাসে তাই সে ওর খুটি নাটি জিজ্ঞাসা না করে পারে না। বলো না রাজা এতোক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?

আসলে রাজা আজ শ্রমিকদের সঙ্গে কাজে যায়নি, সে গিয়েছিলো আর এক উদ্দেশ্য নিয়ে। জিংহার অনেক জায়গা তার এখনও দেখা হয়নি, রাজা সত্যিই বললো— আজ কাজে যাইনি।

তবে কোথায় গিয়েছিলে?

ঘনিষ্ঠ আপন জনের মত জিজ্ঞাসা করলো আবার হুংমা।

রাজা জুতো জোড়া খুলে একপাশে রাখতে রাখতে বললো— জিংহা শহরটা দেখতে গিয়েছিলাম।

খিল খিলিয়ে হেসে উঠলো হুংমা— তুমি বড্ড বোকা একা একা কতটুকু দেখলে? যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে তবু হতো।

চিংচু বলে উঠলো— তুমিই বা কতটুকু জানো, জিংহা এতোটুকু শহর নয়, বুঝলে হুংমা— যে তুমি ওকে সব দেখাবে।

হুংমা রাগোত কণ্ঠে বললো— তবে তুমি বুঝি ওকে সঙ্গে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাও? মনে রেখো ওকে আমি তোমার সঙ্গে একদিনও বাইরে যেতে দেবোনা।

চিংচু বিছানায় উঁবু হয়ে শুয়ে শুয়ে কথা বলছিলো— এবার সে উঠে বসে সোজা হয়ে, চোখে মুখে বিস্ময় টেনে বলে— কেনো? কেনো আমার সঙ্গে ওকে যেতে দেবে না?

তুমি বড় মন্দ লোক তা কি আমি জানিনা। তুমি প্রায়ই মদ খাও। ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তুমি মদ খাওয়া শেখাবে।

কি বললে হুংমা? আমি মদ খাওয়া শেখাবো ওকে? আমার নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে ওকে মদ খাওয়া শেখাবো। আমি যেন বড় দায়ে ঠেকে গেছি।

রাজা দেখলো ওরা তাকে নিয়ে অহেতুক কলহ বাঁধিয়ে বসলো, তাই সে হুংমাকে লক্ষ্য করে বললো— তুমি যাও হুংমা আমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বো।

হুংমা রাগাত দৃষ্টি নিয়ে একবার চিংচুর দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলো।

পরদিন একথা নিয়ে তাদের সর্দার হিয়ংচুর সঙ্গে গোপনে আলাপ করলো চিংচু।

হিয়ংচু তখন মদের নেশায় ঢুলু ঢুলু। চিংচু গিয়ে বললো— সর্দার, জানো হুংমা আমাদের সবাইকে অপমান করেছে।

হুংমা আমাদের সবাইকে অপমান করেছে বলিস কি চিংচু!

হাঁ সর্দার।

বল, কি অপমান সে করেছে? আমরা তার বাবার হোটেলে থাকি, পয়সা দিয়ে থাকি খাই। সে আমাদের অপমান করার কে?

শুধু অপমান নয় আমরা মদ খাই এ নিয়েও সে ঐ নতুন লোকটার সামনে আমাকে অপমান করেছে। আমাকে অপমান মানে আমাদের সবাইকে অপমান।

তাতো বটেই, জড়িত কণ্ঠে বললো হিয়ংচু। তারপর আবার বললো— তুই যা, আমি ওকে দেখে নেবো। মালিকের মেয়ে বলে তাকে আমি খাতির করবোনা।

সর্দার হিয়ংচু হুংমাকে ভিতরে ভিতরে ভালবাসতো ওর প্রেমের জন্য লালায়িত ছিলো সে। চিংচুর কথাগুলো তাই ওকে বেশি ভাবিয়ে তুললো, বললো আবার সে—চিংচু, তুই কি বলতে পারিস হুংমা রাজাকে ভালবাসে?

চিংচু মাথা চুলকে বলে— হয়তো বাসে, না হলে সে ওর প্রতি অমন দরদ দেখায় কেনো।

এমন সময় হুংমা এসে দাঁড়ায়, বলে হুংমা— চিংচু, তুমি কার কথা নিয়ে আলাপ করছো?

কেনো তোমার কথা। কাল তুমি ঐ রাজার সামনে আমাকে কেমন করে অপমান করলে?

অপমান করেছি তোমাকে?

করলে না? আমি মদ খাই রাজাকে মদ খাওয়া শেখাবো বলোনি তুমি?

বলেছি, যা সত্যি তাই বলেছি।

এবার হিয়ংচু বলে উঠে —হুংমা তোমার দেশের লোক, সে কোথাকার কে? তার জন্য তুমি আমাদের যা -তা বলবে? যা-তা কখন বললাম? সত্যি সে ভাল, তাকে তোমরা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তোমাদের মত খারাপ অভ্যাস করবে তা আমি বরদাস্ত করবো না। কথাটা বলে দ্রুত চলে যাচ্ছিলো হুংমা।

সর্দার হিয়ংচু পথ আগলে দাঁড়ালো— হুংমা তুমি তারে ভালবাসো নিশ্চয়ই।

হাঁ, বাসি।

জানো তোমার বাবা যদি জানতে পারে তোমার কি অবস্থা হবে?

জানি।

মনে রেখো হুংমা এরপর যদি ওকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে কোন রকম কলহ করো তাহলে আমরা সব কথা তোমার বাবাকে বলে দেবো।

বেশ দিও কিন্তু মনে রেখো তোমরা যদি আমার নামে আমার বাবার কাছে কিছু যা-তা লাগাও আমিও তোমাদের ক্ষমা করবো না। এ হোটেল তোমাদের ছাড়তে হবে। কথাটা বলে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে বেরিয়ে গেল হুংমা।

এতোক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো রাজা। সে ঐ সময় হোটেলে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো হঠাৎ হুংমার সঙ্গে হিয়ংচুর কথাগুলো কানে যায় তাই সে আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো।

হুংমা বেরিয়ে যেতেই অপর দরজা দিয়ে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে রাজা। সোজা সে একটা টেবিলে গিয়ে বসে এক গেলাস কফি আনার জন্য বয়কে নির্দেশ দেয়।

হঠাৎ রাজাকে কক্ষ মধ্যে আসতে দেখে প্রথমে হিয়ংচু দলবল সহ ঘাবড়ে যায়। এ-ও তাকায় এও-র মুখে।

বনহুর যেন কিছু শোনেনি। এমনি ভাব টেনে সিগারেট কেসটা বের করে নিজে একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে গুজে সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে ধরে হিয়ংচুর সামনে।

এতোক্ষণে হিয়ংচুর মুখভাবটা প্রসন্ন হয়ে আসে। সে ভাবে তাহলে রাজা হুংমার সঙ্গে তাদের কথা বার্তার কিছু শোনেনি। হৃদকম্পটা কমে আসে ওর ধীরে ধীরে। হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট তুলে নেয় সে তারপর সঙ্গীদের ডেকে বলে—নে, রাজার কেস থেকে সিগারেট নে। রাজা বড় ভাল মানুষ।

রাজার হাতের সিগারেট কেস থেকে ওরা এক একটা করে সিগারেট তুলে নিলো।

রাজা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে এক মুখ ধোয়া ত্যাগ করে বললো—এতোক্ষণ হুংমার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিলো তোমাদের হিয়ংচু?

না না ও কিছু নয় রাজা ও কিছু নয়। একটা সামান্য কথা নিয়ে ওর সঙ্গে------

আমি সব শুনেছি হিয়ংচু। শোন আমার ব্যাপার নিয়ে কোন সময় হুংমার সঙ্গে কোন রকম গণ্ডগোল করোনা। করলে ভাল হবেনা বুঝলে?

ঢোক গিলে বললো হিয়ংচু—বুঝেছি।

ওর সঙ্গীরা একবার হিয়ংচুর সঙ্গে মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলো।

❑

সেদিন বনহুর একাই বসেছিলো দোতালার রেলিংএর ধারে। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওদিকের তক্তার বেড়া ঘরগুলোর আড়ালে ধীরে ধীরে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মির আভাটুকু মিলিয়ে যাচ্ছে।

তক্তার ঘরগুলোর চালে দু'একটা কাক পাখা ঝাপটে কা কা রব তুলেছে হয়তো বা বেলা শেষে বাসায় ফিরে যাবার জন্য সঙ্গীর সন্ধান করছে।

এখনও হোটেলের স্থায়ী বাসিন্দারা ফিরে আসেনি। হোটেল পিউলপাং নীরব নিঝুম শান্ত। ওরা ফিরে এলে ঘুম ভাংবে পিউলপাং এর। সমস্ত হোটেলটা তখন অশান্ত বালকের মত চঞ্চল হয়ে উঠবে, মুখর হয়ে উঠবে বিয়ে বাড়ির মত।

শা টেবিলগুলোর উপরে তখন কাঁচা চামচ আর চীনা মাটির বাসনগুলোর ঠুন ঠান আওয়াজ উঠবে আর তার সঙ্গে নানা রকম কথা বার্তার প্রতিধ্বনি শোনা যাবে।

বহু পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ জড়িয়ে একটি নারী কণ্ঠের কল কল খিল খিল হাসি হোটেলের ভিতরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠবে। হুংমা প্রত্যেকটা টেবিলে গিয়ে একটিবার দাঁড়াবে। কারো বা চুল ধরে একটু টেনে দেবে, কারো বা নাক ধরে কারো গাল টিপেও আদর করবে। তার সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফুল ঝুরি ছড়িয়ে দেবে সবার মনে।

হুংমা যেন এ হোটেলের প্রাণ।

হোটেল বাসীরা সবাই তাই ওকে ভাল না বেসে পারে না। হুংমাকে কাছে পাবার জন্য কেউ কেউ বেশ উৎসাহী কিন্তু হুংমা সে ধরণের মেয়ে নয়। সবাই তাকে পেতে চাইলেও সে এখনও কাউকে ধরা দেয়নি, ভালও সে বাসেনি কাউকে।

হুংমা ইচ্ছা মত চলাফেরা করে।

হুংমার চেহারা কেউ কেউ সন্দেহ করতো, হুংমা পিউলপাং হোটেলের মালিক চিহুয়াংচির মেয়ে নয়, কিন্তু সত্যি সে তার মেয়ে যদিও চেহারাখানা বাপ মেয়ের সম্পূর্ণ আলাদা ছিলো।

হুংমার বাবাকে ওর বন্ধুরা বলতো, এ মেয়ে তোমার না আর কারো? অবশ্য সবাই এ কথা বলতো না যারা জানতো হুংমার মা চীনা মেয়ে নয়, হুংমার মা বিদেশী।

এ প্রশ্ন বনহুরের মনেও যে জাগেনি তা নয়। হুংমার দিকে তাকিয়ে ভাবতো বনহুর চিহুয়াংচির চেহারা আর হুংমার চেহারা সম্পূর্ণ পৃথক লাগে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগলেও সে ইচ্ছা করে কোনদিন এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়নি বা কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেনি।

আজ সকাল সকাল বাহির থেকে ফিরে এসেছে বনহুর। টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়াই ছিলো, বয় এসে আগলা করে দিয়েছে। এ হোটেলে যার যার টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে কারণ দুপুরে যারা খায়না এ খাবার তাদেরই জন্য। বনহুর খেয়ে দেয়ে খোলা রেলিং-এর পাশে এসে বসেছে, দৃষ্টি তার পথের দিকে। মাঝে মাঝে মাল বোঝাই ট্রাকগুলো এক রাশ লালধূলো ছড়িয়ে বিকট শব্দ করে চলে যাচ্ছিলো। কোন কোনটা ত্রিপলে ঢাকা আর কোন কোনগুলোর কাঠের বাক্স তবে ত্রিপলে ঢাকা নয়।

বনহুর আপন মনে ভেবে চলেছে আজ ক'দিন হলো সে এই জিংহা শহরে এসেছে। যদিও তার কাছে এ শহরটা সম্পূর্ণ অপরিচিত তবু সে বহু জায়গা

এরি মধ্যে ঘুরে ফিরে দেখেছে, কখন সে অবাক হয়েছে কখনও হতবাক হয়ে গেছে। জিংহা অদ্ভুত শহর।

বনহুর সামান্য শ্রমিকের বেশেই এই হোটেলে উঠেছে। সে যখন বাহিরে যেতো শ্রমিকের বেশে যেতো তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ কোন সময় ছদ্মবেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়তো। হোটেলের কেউ টের পেতো না, এমন কি হুংমাও নয়।

আজ ক'দিন সে বহু জায়গা ঘুরছে কিন্তু এখনও হামবার্টের কোন সন্ধান পায়নি। যে হামবার্টের প্রধান সহচরটি সেদিন আচমকা এসে হাজির হয়েছিলো হোটেল পিউলপাং-এ তারও কোন খোঁজ মেলেনি আর।

লোকটা হঠাৎ কোথা থেকে এসেছিলো আবার জিংহার জনসমুদ্রের কোথায় সে ডুব মারলো কে জানে? বনহুর কোনক্রমে আর একবার ওর সম্মুখে হাজির হতে পারলে............

আচমকা বনহুর যেন চমকে উঠলো।

সে স্পষ্ট দেখতে পেলো একরাশ লাল ধুলো ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে সেই গাড়িখানা যে গাড়িতে সেদিন এসেছিলো ফাংফা হামবার্টের প্রধান সহচর। আশায় আনন্দে চোখ দুটো তার জ্বলে উঠলো যেন।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর সঙ্গে সঙ্গে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রেলিং ছেড়ে নেমে চললো সে তর তর করে নিচে। ততক্ষণে গাড়িখানা এসে থেমে পড়েছে পিউলপাং-এর সামনে। হোটেলে তখন কেউ না থাকায় বনহুর এগিয়ে এলো, সেদিন যে ভাবে হোটেলবাসীরা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো বনহুর সেই ভাবে ফাংফা শয়তানটাকে অভিনন্দন জানালো।

প্রথমে অবাক হলেও পরক্ষণে ফাংফা নিজকে সামলে নিয়ে বললো— তোমার সঙ্গীরা কোথায়?

বনহুর স্বাভাবিক সচ্ছ কণ্ঠে বললো— তারা এখনও ফিরে আসেনি। যদি অনুগ্রহ করে আমাকে জানান তাহলে....

একটা শব্দ করলো ফাংফা —হু! তারপর বললো— চিংচুকে বলো সে যেন প্রস্তুত থাকে, কাল রাত দুটোর পর আমি আসবো তাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

বনহুরের মনটা যেন নেচে উঠলো আনন্দে। না চাইতেই বৃষ্টিপাতের মত অবস্থা। যে কারণে সে সুন্দর কান্দাই থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এই জিংহায় এসেছে। যে কারণে সে আজ ক'দিন থেকে জিংহার নির্দিষ্ট কতকগুলো জায়গা চষে ফিরছে। হঠাৎ সেই শয়তানের অনুচরই এলো তাকে অভিনন্দন জানাতে।

অন্তরের খুশি বনহুর মুখে প্রকাশ করলো না, সে মাথা দুলিয়ে বললো—নিশ্চয়ই বলবো।

ফাংফা বললো—ভুলে যেও না তাহলে কিন্তু তোমার পরিণতি ভয়ঙ্কর মনে রেখো।

রাখবো, নিশ্চয়ই রাখবো.....

হাঁ..... কথাটা উচ্চারণ করে ফাংফা উঠে গিয়ে তার গাড়িতে বসলো।

সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে ওর দেহের মনি মুক্তা খচিত বস্ত্রাদি ঝকমকিয়ে উঠলো যেন। চামচিকের মত গোঁফ জোড়াতে একবার হাত বুলিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো সে।

বনহুর করজোড়ে প্রনিপাত জানাল।

গাড়িতে বসে একটু মাথানত করলো ফাংফা।

গাড়ি চলে গেলো।

এবার বনহুর মনের আনন্দটাকে ধরে রাখতে পারলো না, হেসে উঠলো সে ভীষণভাবে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হুংমা তার পিছনে এসে দাঁড়ায়। রাজাকে সে একা একা হাসতে দেখে বলে—রাজা তুমি হাসছো কেন?

রাজা তখন হাসি থামিয়ে হুংমার-মাথার ক্যাপটা খুলে নিজের মাথায় পরে বলে—তোমার কথা মনে করে হাসছিলাম হুংমা।

আমার কথা মনে করে?

হাঁ।

তুমি আমার কথা মনে করো রাজা?

করি।

সত্যি বলছো?

সত্যি।

রাজা!

বলো?

তুমি খুব ভাল!

হাঁ। ছোট্ট একটা শব্দ করে মাথার ক্যাপটা খুলে আবার রাজা পরিয়ে দেয় হুংমার মাথায়। বলে রাজা—এতোক্ষণ কোথায় ছিলে হুংমা? একা একা আমার মোটেই ভাল লাগছিলোনা।

হুংমা রাজার বুকের কাছের জামাটা দু'হাতে এটে ধরে বলে—আমি না থাকলে তোমার ভাল লাগেনা বুঝি?

হাঁ। তুমি না থাকলে আমার বড্ড খারাপ লাগে। আচ্ছা হুংমা এতোক্ষণ কোথায় ছিলে তাতো বললেনা? বনহুর জানে হুংমা হোটেলে থাকলে সে চুপ চাপ ঘরের কোণে বসে থাকতো না। বড় চঞ্চল এই মেয়েটি।

রাজার কথায় হুংমার চোখ দুটো ছলছল করে উঠে, কতকটা আনমনা হয়ে যায় সে।

রাজা বলে— হুংমা কোথায় ছিলে বলতে যদি তোমার কোন অসুবিধা থাকে বলোনা।

না কোন অসুবিধা নেই। মায়ের কবর দেখতে গিয়েছিলাম। ও.... রাজা একটা শব্দ করলো।

হুংমা বললো— যাবে একদিন আমার সঙ্গে?

কোথায়?

আমার মায়ের কবর দেখতে?

যাবো।

রাজা তুমি কত ভাল। চিংচু হিয়াংচু ওরা কোন দিন আমার সঙ্গে যায় না।

যখন রাজা আর হুংমার কথা হচ্ছিলো তখন শ্রমিকরা ফিরে আসে হোটেলে। দূর থেকেই ওরা লক্ষ্য করে হুংমা আর রাজা হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

চিংচু হিয়ংচুর কানে মুখ নিয়ে বলে— দেখলে রাজা আর হুংমা কেমন গভীরভাবে কথা বার্তা বলছে। তুমি যাই বলো সর্দার, আমার কিন্তু রাজা আর হুংমার মেলা মেশা মোটেই ভাল লাগেনা।

হিয়ংচু চোখ দু'টোকে ক্ষুদ্র করে নিয়ে ভ্রুকুঁচকে বলে আমারও কি ভাললাগে? মোটেই আমি দেখতে পারিনা ঐ রাজাটাকে। ও আসার পর থেকে হুংমা সব সময় যেন ওকে নিয়ে মেতে থাকে।

চিংচু চোখ বাঁকিয়ে আর একবার রাজাকে ও হুংমাকে দেখে নিয়ে বলে— হুংমা কিন্তু রাজা আসার আগে তোমাকে বেশি খাতির করতো।

হুঁ।

রাজাকে তুমি কাবু করতে পারলেনা হিয়ংচু?

কি করে ওকে কাবু করবো দেখলে তো সেকি মানুষ, না দৈত্য।

হিয়ংচু আর চিংচু যখন অদূরে কথা বলছিলো ততক্ষণে অন্যান্য শ্রমিকগণ হোটেল কক্ষে প্রবেশ করে নানা রকম হুই হুলোড়ে মেতে উঠেছে।

রাজা আর হুংমা চলে যায় দোতালার সিড়ি বেয়ে উপরে।

চিংচু বলে, কথাটা হুংমার বাবাকে বললে কেমন হয়?

না, এখনও সময় আসেনি। ওর বাবাকে বলবো যেদিন সেদিন রাজাকে এ হোটেল ছাড়তে হবে। কথাগুলো বললো হিয়ংচু।

এবার ওরা দু'জন হোটেল কক্ষে প্রবেশ করে দু'জন দুটো চেয়ার দখল করে নিয়ে বসলো।

❑

শ্রমিকরা সবাই যে যার কাজে চলে গেছে।

বনহুর আজ কাজে যায়নি, সে নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিগারেটের পর সিগারেট পান করে চলেছে। তার মাথার মধ্যে রাশি কৃত চিন্তা সাঁতার কাটছিলো আজ রাত দু'টোয় হামবার্টের বিশেষ অনুচর ফাংফা আসবে চিংচুকে নিতে। সে যদি চিংচুকে কথাটা বলতে ভুলে যায় তাহলে, তার পরিণতি নাকি অতি ভয়ঙ্কর কিন্তু সে এখনও বলেনি কথাটা চিংচুকে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হুংমা এসে একরাশ জোছনার আলোর মত ছড়িয়ে পড়েলো বনহুরের শরীরের উপড়।

চমকে উঠলো বনহুর—হুংমা তুমি।

হুংমা তখনও বনহুরের শরীরের উপর নিজকে ছেড়ে দিয়ে আছে, বললো—আ—মি—হু—ং—মা—দেখতে পাচ্ছো—না?

একি হুংমা তুমি নেশা করেছো?

নেশা! নে—শা আমি করেছি—একটু—একটু সামান্য—সা-মা—ন্য......রাজা?

বনহুর সোজা হয়ে বসে হুংমাকে দু'হাতে তুলে ধরে হুংমা তুমি নেশা করো এ আমি জানতামনা। তুমি না বলেছিলে চিংচু আর ওরা মন্দ লোক নেশা করে মদ খায়?

রাজা আর কোনদিন ওসব খাবেনা। তুমি যেন কোনদিন খেও—না কেমন? রাজা কথা দাও—কথা দাও তুমি নেশা করবেনা? যারা নে—শা করে তারা খুব—মন্দ লোক

তবে তুমি নেশা করলে কেনো?

রাজা ও তুমি বুঝবেনা। আমার মাকে মনে হলে আমি থাকতে পারিনা। এবার হুংমা বনহুরের বুকের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে তারপর বলে—তুমি শুনবে আমার কাহিনী?

বনহুর বিব্রত বোধ করছিলো, একটা জোয়ান মেয়ে এমন করে তার বুকে হেলান দিয়ে কথা বলছে; হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে তখন কি মনে

করবে। যদিও এসব ব্যাপার এসব দেশে তেমন দোষণীয় নয় তবু ভাল লাগেনা ওর কাছে। বললো বনহুর—তুমি শুয়ে শুয়ে বলো আমি বসে বসে তোমার কথা শুনবো।

না আমি এই তো বেশ আছি। রাজা তুমি আমার এখানে একটা চুমু দাও, হুংমা আংগুল দিয়ে নিজের তুষার শুভ্র গন্ডটা দেখিয়ে দেয়।

বনহুরের শিরায় শিরায় ধমনিতে জাগে শিহরণ। একটা অদম্য অনুভূতি তাকে বিচলিত করে তোলে।

হুংমা সুকোমল শুভ্র বাহু দুটি দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরলো, নেশাতুর অৰ্দ্ধ নিৰ্মিলিত আঁখি দুটি মেলে তাকালো। কই, চুমু দেবেনা আমায়? সত্যি আমায় কেউ ভাল বাসেনা আমার বাবাও না। সবাই আমাকে......নানা তুমি কিছু জানোনা। তুমি জানবেই বা কি করে। আমি তো আর তোমার কাছে কিছু বলিনি। জানবে কি করে তাই না?

বনহুরের চোখে তখন অপলক দৃষ্টি সে কোন জবাব দিতে পারেনা। স্থির নয়নে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

যদিও হুংমার মুখ থেকে তীব্র মদের গন্ধ বের হচ্ছে তবু বনহুর হাত দু'খানা সরিয়ে দিতে পারেনা নিজের গলা থেকে। মোহ গ্রস্তের মত বলে বনহুর—কই, বলো তোমার কাহিনী?

হাঁ আগে বলি না হলে তুমি আমায় চুমু দেবেনা? সত্যি রাজা কি সুন্দর তোমার দুটি চোখ, কি সুন্দর তোমার চুলগুলো, সত্যি কত সুন্দর তোমার নাকটা, কত সুন্দর তোমার দুটি ঠোঁট। অদ্ভুত তুমি রাজা। তোমার ঠোঁট দুটো আমার চিবুকে স্পর্শ করলে আমি অনেক, অনেক খুশি হবো। সত্যি তোমাকে আমি আমার কাহিনী শোনালে চুমু দেবে তো?

দেবো।

সত্যি?

হাঁ সত্যি।

জানো রাজা? সোজা হয়ে বসলো হুংমা তারপর অৰ্দ্ধ মেলিত আঁখি দুটি মেলে তাকালো বনহুরের মুখে। —আমার মা বাবার কাছে কোন দিন সুখি হয়নি। যেদিন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছিলো সেই দিন থেকে আমি দেখেছি আমার বাবা মাকে রোজ রোজ মারতো। মাকে কি সব বলতো মা শুধু বলতো তুমি আমাকে মেরে ফেলো আমি পারবোনা আমি পারবোনা...মায়ের কথা শুনে বাবা আবার মারতো, মা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যেতো। তবু মারতো, আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। মার কষ্ট আমাকে অস্থির করতো তবু তার কাছে যাবার সাহস হতোনা। মার সমস্ত শরীরে আঘাতের দাগ দেখেছি। কালো কালো জখমের

দাগ। জানো রাজা, মার বুকের এক জায়গায় গভীর একটা ক্ষত হয়ে গিয়েছিলো, বাবা বুট দিয়ে লাথী মেরেছিলো মায়ের বুকে। আজও আমার শরীর শিউরে উঠে। মার কথা বলতে বড্ড কষ্ট হয় আমার তবু বলছি তোমাকে। রাজা সব শুনে দুঃখ পাবে তবু বলবো তোমাকে। শুনবেনা তুমি?

শুনবো বলো?

একদিন রাতে মায়ের কান্না শুনে ঘুম ভেংগে গেলো আমার চোখ মেলতেই কুঁকড়ে গেলাম—দেখলাম বাবা মাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। মা চিৎকার করে বলছে—না, না তুমি আমার সর্বনাশ করো না। আমি যাবো না, আমি যাবোনা। তুমি আমাকে নিয়ে যেওনা। তবু বাবা মাকে টেনে নিয়ে গেলো পাশের কামরায়। জানো রাজা আমি যেন তখন কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। পাশের কামরায় অন্য একটা পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেলাম তার সঙ্গে শুনতে পেলাম মার আর্তনাদ। বাবা কিন্তু তখন ফিরে এসেছে আমার ঘরে। সে ঘন ঘন পায়চারী করছে।

ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে রাজার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন, বললো—তারপর?

বাবা বার বার তাকাচ্ছে আমার দিকে। বলে চললো হুংমা আমি যেমন উঠতে যাবো অমনি বাবা আমাকে চেপে ধরে আমার বালিশে শুইয়ে দিলো। আমি ভয়ে কাঠ হয়েছিলাম আরও কাঠ হলাম। চুপ করে চোখ বুজে পড়ে রইলাম তারপর ঘুমিয়ে গেছি এক সময়। যখন ঘুম ভাংলো দেখি মা আমার পাশে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি কিছু বুঝতে পারলামনা। তাকিয়ে দেখলাম বাবা ঘরে নেই। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা তোমার কি হয়েছে? মা আমার কথা শুনে আরও জোরে জোরে কেঁদে উঠলো। আমি তাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলাম না। জানো রাজা তারপর থেকে মাকে রোজ রাতে পাশের ঘরে নিয়ে যেতো বাবা। কোন দিন টেনে হিচড়ে কোন দিন মেরে ধরে, কোন দিন মা স্বইচ্ছায় যেতো। দিনের পর দিন গড়িয়ে যেতে লাগলো। দেখতাম আমাদের হোটেলে খদ্দের আগের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে গেছে। রোজ রোজ নতুন নতুন মানুষ দেখতাম। তারা আমাদের হোটেলে দু'চার দিন থাকতো তারপর যাবার সময় বাবাকে অনেক টাকা দিয়ে চলে যেতো। পরে পরে আমি দেখছি মা তেমন আর কাঁদতো না কিন্তু মাকে সব সময় গম্ভীর দেখেছি। একদিন মাকে বাবা ওঘরে নিয়ে যাবার পর আমি চুপি চুপি তক্তার ফাঁকে চোখ রেখে দেখলাম, বাবা মাকে ওঘরে রেখে বেরিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা বেটে লোক মাকে ধরে ফেললো, মা ধস্তা ধস্তি করলো লোকটার সঙ্গে। লোকটা জোর করে মায়ের দেহ থেকে......না, না আর আমি বলতে পারবো না

রাজা। জানো তারপর দিন আমি মাকে সব কথা বললাম। মা জানতে পারলো আমি মার সব কিছু জেনে ফেলেছি তখন মা আমাকে বুকে জড়িয়ে অনেক কাঁদলো। রাজা আমি সেদিন তখনও বুঝতে পারি নাই মা কেনো আমাকে বুকে ধরে এমন করে কাঁদছে। থামলো হুংমা, চোখ দুটো ওর ছল ছল হয়ে এসেছে।

বনহুর তখন সম্পূর্ণ নীরব।

হুংমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললো—পরদিন চিৎকার আর আর্তনাদের তীব্র শব্দে ঘুম ভেংগে গেলো আমার। জেগে উঠে দেখি হোটেলের বাসিন্দারা দৌড়াদৌড়ি করছে। বাবাকে দেখতে পেলাম না। আমি বিছানা ছেড়ে নিচে নেমে গেলাম। জানো রাজা কি দেখলাম, আমার মার দেহটা পড়ে আছে হোটেলের মেঝেতে। ভয়ে আঁতকে উঠলাম। মাকে চেনা যায় না যেন একটা পোড়া কাঠ। মা তার শরীরে আগুন দিয়ে পুড়ে মরেছে।

অস্ফুট কণ্ঠে বললো রাজা—তোমার বাবা এতোবড় শয়তান?

হাঁ রাজা, বাবা শয়তান। মা চলে যাবার পর আবার বাবার হোটেলের খদ্দের কমে এলো। আবার বাবার জীবনে এলো অভাব রাক্ষসীর করাল থাবা। অর্থের লালসা বাবাকে ভীষণভাবে পেয়ে বসেছিলো। বাবা মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতো। ক'বছর যেতে না যেতে বাবার ভাবনার অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে এলো। আমার শরীরে যৌবন দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার চোখে একটা কেমন যেন লোভাতুর দৃষ্টির আভাস দেখতে পেয়েছি। বাবার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। মা মরে যাবার পর থেকে বাবা সব সময় আমাকে ভাল ভাল খেতে দিতেন। হয়তো বা আমাকে বড় করে তোলার জন্যই তার এতো আগ্রহ। আমি ক'বছর আগেও বুঝতে পারিনি বাবার মনোভাবের কথা। বুঝতে পারলাম দু'বছর আগে, বাবা যেদিন আমাকে ধরে নিয়ে গেলো একটা লোকের পাশে। লোকটা প্রথমে আমাকে আদর করে কাছে ডেকে নিলো তারপর অনেকগুলো টাকা গুজে দিলো আমার হাতে। খুশিতে আমার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। হয়তো আমার চোখের চেয়ে বাবার চোখ দুটো বেশি জ্বলজ্বল হয়ে উঠেছিলো। সেদিন আমার সেদিকে খেয়াল ছিলো না। এরপর থেকে লোকটা রোজ আসতো আমাকে আদর করে টাকা দিতো। লোকটা কয়েক ঘন্টা থাকতো তারপর চলে যেতো। লোকটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমার হাত থেকে চিলের মত ছো মেরে টাকাগুলো নিয়ে নিতো। তখন বাবাকে শূকরের মত দেখাতো। এরপর বাবা আমাকে আরও লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো, তারা আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতো। আমার ভাল লাগতো না। একদিন ঐ লোকটা যে প্রথম থেকেই আমাকে

টাকা দিতো সে রাতে বাবার হোটেলে থাকবে বলে কথা হলো। রাতে বাবা মাকে যেমনভাবে টেনে হিচড়ে নিয়ে যেতো তেমনি আমাকেও নিয়ে গেলো ঐ ঘরে। আমি অবশ্য তেমন কোন ভয় পাইনি, একটু কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিলো বাবাকে দেখে। সেদিন বাবার মুখে একটা কঠিন ছাপ দেখতে পেলাম। থামলো হুংমা।

বনহুর ভ্রু কুঞ্চিত করে তাকিয়েছিলো হুংমার মুখে। আজ হুংমা তার সম্মুখে বসে যেমন করে তার জীবন কাহিনী বলছে এমনি করে একদিন শাম্মীও বলেছিলো তার জীবন কাহিনী। হয়তো বা হুংমার চেয়েও দুঃখময় ছিলো তার জীবন। তবু আজ হুংমার কাহিনী শুনে মনটা ব্যথা কাতর হয়ে উঠে। বলে উঠলো বনহুর—তোমার বাবা শুধু শয়তানই নয় নরপশু জানোয়ার।

হাঁ রাজা, সত্যি আমার বাবা তাই।

তারপর লোকটা তোমাকে প্রতি বারের মত আদর করে টাকা হাতে গুজে দিলো কেমন?

তাহলে তো আমি লোকটাকে দেবতা বলতাম।

তবে লোকটা দেবতা নয়?

না রাজা, সে আমার হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে বাবাকে ইংগিৎ করলো বেরিয়ে যেতে। বাবা তক্ষুণি বেরিয়ে গেলো। আমার মনে তখন কেমন যেন একটা ভীতিভাব মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠলো। লোকটা লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছিলো আমার শরীরের দিকে। বাবা বেরিয়ে যেতেই লোকটা আমাকে দু'হাতে জাপটে ধরলো।

আর তুমি কি করলে?

ভীষণ জোরে কামড়ে দিলাম লোকটার হাতে।

বনহুরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো মনিরার সঙ্গে তার একদিনের কথা। মনিরা তাকে চিনতে না পেরে নিজকে ওর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তার হাতে ভীষণভাবে কামড়ে দিয়েছিলো, দাঁত বসে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিলো তার হাত দিয়ে। একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোটের ফাঁকে, ভাবে সে—মেয়েদের নিজকে রক্ষা করার জন্য তাদের দাঁতই প্রধান অস্ত্র। হুংমাও দাঁত দিয়ে নিজকে রক্ষার চেষ্টা করেছিলো।

বনহুর বললো—তারপর?

লোকটার কবল থেকে নিজকে সেদিন বাঁচিয়ে নিলাম। আমার দাঁতগুলো বসে গিয়েছিলো ওর হাতে। কাজেই লোকটা আমাকে ছেড়ে দিলো বাধ্য হয়ে। আমি ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম আমার ঘরের। বাবা পরে এসে অনেক ডাকা ডাকি করেছিলো কিন্তু আমি সে রাতে আর দরজা খুলি

নাই। বহুক্ষণ ধরে দরজায় পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছিলাম। কখন যেন পা দুটো ধরে এসেছিলো, ভোরে জেগে দেখি দরজার পাশে মেঝেতে পড়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছি। রাতে কিছু খাইনি কাজেই খিদেতে পেট চোঁ চোঁ করছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। গত রাতের ঘটনাটা মনের পর্দায় ভেসে উঠলো, আমি শিউরে উঠলাম। তখন বুঝবার মত বয়স আমার হয়েছিলো। বাবার ইচ্ছা আমাকে দিয়ে আবার তার হোটেলে সব গরম করে তোলে, বুঝতে বাকি রইলো না আমার। মাকে বাবা প্রতি রাতে কেনো পাশের ঘরে জোর করে নিয়ে যেতো এখন নতুন করে আমার স্মরণ হতে লাগলো। বাবার মুখখানা আমার কাছে ভয়ঙ্কর লাগতে লাগলো। কেমন করে বাবার হাত থেকে নিজকে বাঁচাবো ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এলো যাতে বাবাও খুশি থাকে, হোটেলেও খদ্দের হয় আর আমিও বাঁচি।

হুংমার মাথায় কি এমন বুদ্ধি এসেছিলো যা তার বাবাকে খুশি করেছিলো—হোটেলেও খদ্দের জুটিয়ে ছিলো আবার হুংমাও নিজকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে বনহুর হুংমার দিকে।

হুংমা বলে চলেছে—সেদিন থেকে আমি নতুন পথ বেছেছিলাম। কুঁকড়ে যাওয়া দুর্বল মনটাকে ঝেড়ে ফেলে সবল করে নিলাম। বাবার হোটেলের বাসিন্দাদের সবাইকে সন্তুষ্ট করে চললাম। জানো রাজা আজও কেউ আমার সতীত্ব নষ্ট করিতে পারেনি। সবাইকে আমি মাতীয়ে রাখি, আমি কাউকে ধরা দেইনি আজও......একটু থেকে বললো হুংমা—বাবা জানে আমি তার হোটেলের সবাইকে নিজের দেহ দিয়েছি বিলিয়ে......খিল খিল করে হেসে উঠে হুংমা। বাবা জানেনা তার মেয়ে শুধু অভিনয় করে চলেছে। রাজা আমি কাউকে মনের মত পাইনি তাই পারিনি তাকে গ্রহণ করতে। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে.....

হুংমার কথায় একটুও আশ্চর্য হয়না বনহুর কারণ হুংমার শেষ কথাগুলো সে বহুবার বহু নারীর মুখে শুনেছে। দোষ সে কাউকে দেয়না কারণ জানে এ জন্য সে নিজেই দোষী বা দায়ী। নারীমন সব চেয়ে সরল সহজ আর দুর্বল তাই ওরা একটুতেই আত্মহারা হয়ে পড়ে। তেমনি হুংমা তার প্রেম ভালবাসা পাবার জন্য উন্মুখ হবে তাতে আর এমন আশ্চর্যের কি আছে?

হুংমা বনহুরের দিকে মুখখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলে আমার কাহিনী তোমাকে শোনালাম, আমায় একটু চুমু দেবেনা।

আজ থাক হুংমা আর একদিন?

না, আমি তোমাকে ছাড়বোনা তুমি বড্ড মিথ্যাবাদী। আমাকে তুমি ভাল বাসবেনা রাজা?

বাসবো।

তবে চুমু দাও।

হুংমা।

বাঃ দেরী করছো কেনো বাবা এসে পড়তে পারে। চিংচু আর হিয়ংচুকে আমি কেয়ার করিনা। ওরা সবাই লোভি ঠিক কুকুরের মত। জানো রাজা ওরা আমাকে চুমু দিতে চায় কিন্তু আমি ওদের ঘৃণা করি। রাজা বাবা আমার সর্বনাশ করবে যেমন আমার মায়ের করেছিলো। বাবাকে আমার বড় ভয়।

হুংমা তুমি যাও শুয়ে শুয়ে ঘুমাও গে।

না আগে চুমু দাও।

তাহলে চলে যাবে তো?

যাবো।

বনহুরের মাথাটা নত হয়ে আসে হুংমার মুখের দিকে।

ঐ মুহূর্তে হুংমার বাবা হিহুয়াংচি এসে পড়ে, কঠিন কণ্ঠে ডাক দেয়—হুংমা।

বনহুর সোজা হয়ে বসে।

হুংমা টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়—বাবা তুমি?

হুংমা, তুমি বিদেশী খদ্দেরের সঙ্গে এতোখানি মাখামাখি করবে আমি ভাবতে পারিনি। তোমার জন্য জিহাংহায় বহু খদ্দের আছে যারা তোমার জন্য আমাকে অনেক টাকা দেবে।

বাবা দিদেশী হলেও রাজা তোমার হোটেলের একজন বড় খদ্দের। বাবা রাজাও তোমাকে কম টাকা দেয়নি সে কথা এরি মধ্যে ভুলে গেলে?

টাকা সে পাওনার চেয়ে বেশি দিয়েছে সে কথা সত্য কিন্তু রাজা বিদেশী না হলে আমি তোমাকে কোন কথাই বলতাম না হুংমা এখন থেকে চলে যাও আর কোন দিন যেন রাজার সঙ্গে ওভাবে মিশবেনা। যাও যাও হুংমা।

হুংমা বাবার মুখের উপর আর কোন কথা বলতে সাহসী হলোনা। পাশের টেবিল থেকে ক্যাপটা তুলে নিয়ে মাথায় পরতে পরতে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর বুঝতে পারে এবার তার উপর বাক্যবাণ নিক্ষেপ হবে। সেজন্য বনহুর প্রস্তুত হয়ে নেয় কিন্তু হুংমা চলে যেতেই হুংমার বাবা এগিয়ে এসে ডান হাত খানা বাড়িয়ে বনহুরের হাতখানা ধরে ফেলে বলে—রাগ করোনা রাজা হুংমা বড্ড ছেলে মানুষ তাই কিছু বোঝেনা এমন দিনের বেলায় সে তোমার কাছে এসে মেলামেশা করলে আমার আর খদ্দেররা হঠাৎ দেখে ফেলতে পারে। তারা তোমার উপর আক্রমণও চালাতে পারে। আমি চাই

না তুমি বিপদে পড়ো। এরপর আমি হুংমাকে তোমার সঙ্গে মিশবার সুযোগ করে দেবো......

বনহুরের ভ্রুকুঁচকে উঠে, বাপ হয়ে মেয়ের প্রতি যে ইংগিতপূর্ণ আভাষ চিহুয়াংচি দিলো তাতে ঘৃণায় বিরক্তিতে ভরে উঠলো ওর মুখ। কোন জবাব সে দিলো না তখন।

চিহুয়াংচি বেরিয়ে গেলো।

যাবার সময় আর একবার বনহুরের পিঠ চাপ্‌ড়ে দিলো যেন সে রাগ না করে।

এ হোটেলে সবার কাছে যা পায় তার চেয়ে বেশি পায় রাজার কাছে। রাজা যাতে খুশি থাকে এ জন্য হুংমার বাবার চেষ্টার কোন ক্রুটি ছিলো না কিন্তু সে অন্যান্য খদ্দেরের সামনে রাজার সঙ্গে হুংমাকে মিশতে বারণ করতো। হুংমার বাবা জানতো জিংহ্ব বাসীরা বিদেশীদের সংগে মেয়েদের মেলা-মেশা মোটেই পছন্দ করে না। হঠাৎ এ জন্য রাজার মত একটা খদ্দেরকে হারাবে বলে আশঙ্কাও ছিলো হুংমার বাবার।

অবশ্য এই ভরা দুপুরে যদিও হোটেলে শ্রমিকরা কেউ ছিলো না। তবু হুংমার বাবা সাবধানি মানুষ যদি কেউ এসে পড়ে তাই সে তখন সরিয়ে দিলো হুংমাকে। চিহুয়াংচি আরও জানতো হুংমাই তার হোটেলের মোহ। শ্রমিকরা ওর জন্যই এ হোটেল সরগরম করে রাখে তাই সে হুসিয়ার এ ব্যাপারে।

রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন বনহুর একা জেগে। তার মনে তখন চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে। হাত ঘড়িটা দেখে নেয় বনহুর রাত দুটো বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

এমন সময় হুংমার বাবা পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ালো বনহুরের বিছানার পাশে ফিস ফিস করে ডাকলো—রাজা, রাজা......

রাজা তখন দু'চোখে অন্ধকার দেখছে, সর্বনাশ হলো যেন। একটু পরেই আসবে ফাংহা। সামান্য কয়েক মিনিট মাত্র বাকি এর মধ্যে তাকে চিংচু সাজতে হবে। যদিও চিংচুর ছদ্মবেশের সব কিছু সে সংগ্রহ করে ফেলেছে। তবুতো একটু সময়ের দরকার। চিহুয়াংচি কেন এসেছে জানেনা বনহুর। জবাব না দিয়ে পারলো না তাই সে চোখ মেলে বললো—বলো কি বলছো?

ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে বললো চিহুয়াংচি—চুপ, উঠে এসো আমার সংগে!

বনহুর বললো—কোথায় যাবো?

হুংমার ঘরে।

মুহূর্তে বনহুরের মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠলো। এবার বুঝতে পারলো কেনো হুংমার বাবা এতো রাতে তার কাছে এসেছে। মুখভাব প্রসন্ন করে

বললো—বড্ড খারাপ লাগছে চিহুয়াংচি আজ নয় পরে একদিন যাবো হুংমার ঘরে। তাড়াতাড়ি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে বনহুর।

চিহুয়াংচি চলে যায়।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে উঠে পড়ে। ওপাশের বেলকুনির ধারে গিয়ে ড্রেস পাল্টে নেয়। সম্পূর্ণ চিংচুর পোশাক। এবার স্যুটকেস খুলে ছোট্ট আয়নাখানা বের করে গোঁফ জোড়া নাকের নিচে লাগিয়ে নেয়। একটু কালী, তেল আর রং হাতের তালুতে ডলে মুখে চোখে কপালে মাথায় যেন রংটা কিছুটা তামাই দেখায়। এবার সিড়ি বেয়ে নামতে থাকে নিচে।

ঐ মুহূর্তে শোনা যায় হোটেলের বাহিরে গাড়ি আসার শব্দ। বনহুর দ্রুত নেমে আসে নিচে এবং হোটেলের বহিরে এসে অভিনয় ভঙ্গীতে অভিবাদন জানায়। যেমন করে সে দেখেছিলো সেদিন ফাংফা এলে পিউলপাং-এর শ্রমিক দল তাকে অভিবাদন জানিয়েছিলো।

ফাংফা গাড়ি থেকে মুখ বের করে বললো—তাড়াতাড়ি চলে এসো।

চিংচু বেশী দস্যু বনহুর বিনা বাক্যে উঠে বসে গাড়ির পিছন আসনে। ফাংফা ঠিক ড্রাইভারের পাশে বসেছিলো। চিংচু উঠে বসতেই গাড়ি ছাড়বার আদেশ দিলো ফাংফা।

লাল কাঁকর বিছানো পথে লাল ধুলো উড়িয়ে গাড়িখানা ছুটতে শুরু করলো।

চিংচু একবার প্যান্টের পকেটে হাত বুলিয়ে রিভলভারখানার অস্তিত্ব অনুভব করে নিলো।

গাড়িখানা ইট পাথুরের পথে হোচট খেতে খেতে এগিয়ে চললো।

পিছন আসনে চিংচু।

আর সম্মুখ আসনে হামবার্টের প্রধান অনুচর ফাংফা।

গাড়িখানা কোথায় চলেছে জানেনা বনহুর। তার বাসনা এতো সহজে পূর্ণ হবে এ যেন সে আশাই করতে পারেনি আজ ক'দিন থেকে অবিরত ঘুরেছে কাজ করতে পাওয়ার নাম করে। কিন্তু কোন একটু সন্ধান পায়নি এ ক'দিনে।

অনেক কিছু চিন্তা হচ্ছিলো বনহুরের মনে।

যে পথে গাড়িখানা এখন এগিয়ে যাচ্ছে সে পথ পরিচ্ছন্ন মসৃণ পথ নয়। ভাঙ্গা-চূরা আর অন্ধকার। কোন লাইট পোষ্ট নেই এ পথে। জমাট অন্ধকারে এগিয়ে যাচ্ছে দুটো আলোর চোখ।

বনহুরের মনে হচ্ছিলো এ যেন তাদেরই দেশের কোন পরিচিত পথ। হোচট খেতে খেতে গাড়িখানা নেমে এলো মোটা পথে। আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার খানিকটা হাল্কা লাগছে এখন।

চিংচুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ফাংফা জানেনা বনহুর। নানারকম চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে তার মনে। মাঝে মাঝে ফাংফার ভারী নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পথটার দু'পাশে ছোট ছোট ঘরগুলো কুয়াসা ঝাপসায় অন্ধকারে ছবির মত লাগছে।

মাঝে মাঝে কোন কোন বাড়ির দরজার ফাঁকে ক্ষীণ আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে।

এবার চীনের প্রাচীরের কিছু অংশ নজরে পড়তে লাগলো। যেন আকাশে হেলান দিয়ে একটা বিরাট দেয়াল ঘুমাচ্ছে।

বনহুর বুঝতে পারে গাড়িখানা পিউলপং হোটেল থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো যেন গাড়িখানা।

এখানে আশেপাশে কোন বাড়িঘর বা জন প্রাণীর চিহ্ন নজরে পড়ে না। আচমকা গাড়িখানা থেমে পড়ায় চমকে উঠলো বনহুর।

সংগে সংগে ফাংফা ফিরে তাকালো চিংচুর মুখের দিকে। বললো ফাংফা—চিংচু জানো তোমাকে হামবার্ট কেনো ডেকেছে?

চিংচু জবাব দিলো, আমি জানবো কি করে।

হামবার্টের কাছে গিয়ে সব জানতে পারবে। চিংচু তোমার ভাগ্য ফিরে গেছে বুঝলে? এসো আমার সঙ্গে।

চিংচু বললো—চলো।

এসো।

কিন্তু আমার ভয় করছে।

ভয়। কিসের ভয়?

কোনদিন হামবার্টের সম্মুখে আসিনি কিনা তাই। কিন্তু এখানে তো কোন বাড়িঘর বা জঙ্গল দেখছিনা। শুধু একটি লাইট পোষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এতো দূরে এমন নিভৃত্ব জায়গায় প্রান্তরের মাঝখানে লাইট পোষ্ট ব্যাপার কি?

সব জানতে পারবে চিংচু। এসো আমার সঙ্গে। কথাটা বলে ফাংফা লাইট পোষ্টের দিকে অগ্রসর হলো।

যতই লাইট পোষ্টের নিকটবর্তী হলো চিংচু ততই বিস্মিত হচ্ছে কারণ এ ধরণের লাইট পোষ্ট সে কোনদিন দেখেনি। গোড়ার দিকে পিপে বা ড্রাম-এর মত উপরে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে গেছে। ঠিক মাথায় একটা আলো জ্বলছে তবে অত্যন্ত নিস্প্রভ ম্লান।

ফাংফা এসে লাইট পোষ্টের নিচে দাঁড়ালো।

চিংচু ততক্ষণে এসে গেছে ঠিক্ তার পাশে। চিংচুর দু'চোখে বিস্ময়।

ফাংফা চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো আশে পাশে কোথায়ও জন প্রাণী নেই শুধু চাপ চাপ অন্ধকার ছাড়িয়ে আছে।

ফাংফা এবার লাইট পোষ্টের গায়ে এক জায়গায় একটা সাংকেতিক চিহ্নের উপর চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে লাইট পোষ্টের পিপে বা ড্রামের মত অংশে একটি সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে পড়লো।

চিংচুকে লক্ষ্য করে বললো—দেখবে, এ সব যা দেখছো এর এক চুল যেন কাউকে বলবেনা।

জিভ্ কেটে বলে চিংচু—আরে না, না, কিছু বলবোনা।

বললে তোমার মৃত্যু অনিবার্য তাতে কোন ভুল নাই।

জানি, জানি আমাকে এতো বুঝিয়ে বলতে হবেনা মালিক।

চলো। ফাংফা ঐ সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে।

চিংচু তাকে অনুসরণ করলো।

ভিতরে প্রবেশ করতেই লাইট পোষ্টের দেহটার প্রবেশ মুখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেলো।

অদ্ভুত সে পথ।

চারিদিকে কেমন একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ।

চিংচু জিজ্ঞাসা করলো—এ সুড়ঙ্গ পথ কোথায় চলে গেছে জানাবেন কি ফাংফা রাজ?

দস্যু বনহুর একদিন চিংচুর মুখে শুনেছিলো চিংচু ফাংফা কে মাঝে মাঝে ফাংফা রাজ বলে ডেকে থাকে। তাই সে আজ তাকে সেই নামে সম্বোধন করলো।

ফাংফা খুশি হলো। এ ডাকটা তার কাছে বেশ প্রিয়। বললো ফাংফা—চীনের প্রাচীর দেখছো?

বারে চীনের প্রাচীর দেখবোনা? চীনের সন্তান আমি, চীন আমার জন্ম ভূমি......

হাঁ শোন চিংচু?

বলুন ফাংফা রাজ?

হামবার্ট দস্যু চীনের সবচেয়ে বড় দস্যু তা জানো নিশ্চয়ই?

জানি। আর আপনিও কম নন তাও জানি। আর জানি বলেই তো আপনাকে এতো মানি।

হাঁ চিংচু, তা নাহলে কি আর চীন রাজ্যে এতো লোক থাকতে আমি তোমাকে চীন দস্যু রাজের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্বল তো বটেই তোমার আর খেটে খেতে হবেনা।

চিংচুর কপালে গভীর চিন্তা রেখা ফুটে উঠে। কোন জবাব দেওনা সে বা আর কোন কথা বলেনা। একটা জানার বাসনা যদিও তাকে চঞ্চল করে তুলেছিলো তবু সে নীরবে ফাংফাকে অনুসরণ করে চলে।

কিছুটা অগ্রসর হবার পর দেখতে পায় চিংচু, সুড়ঙ্গটার মধ্যে বেশ প্রশস্ত হয়ে আসছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ফাংফা কারণ সম্মুখে একটা ঝুলন্ত লিফ্‌ট এগিয়ে আসছে দেখতে পেলো।

লিফট্‌খানা তাদের সম্মুখে এসে থেমে পড়লো।

ফাংফা চিংচু সহ উঠে বসলো লিফটে।

ওরা চেপে বসার সঙ্গে সঙ্গে লিফট চলতে শুরু করলো। অত্যন্ত দ্রুত বেগে লিফটখানা ইলেকট্রিক তার বেয়ে এগিয়ে চললো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লিফটখানা এমন এক জায়গায় এসে থেমে গেলো যেখানে আর কোন পথ বা মুক্ত জায়গা নজরে পড়েনা।

লিফট থেমে পড়ায় ফাংফা এবং চিংচু নেমে পড়ে।

ফাংফা এবার চিংচুকে লক্ষ্য করে বলে—আমরা চীনের প্রাচীরের পাশে পৌঁছে গেছি।

চিংচু বেশী দস্যু বনহুর তাকায়—এই সেই ঐতিহাসিক চীনের প্রাচীর। যেন প্রাচীর নয় একটি পর্বতের পাদমূলে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। চিংচু বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। লাইট পোষ্ট স্তম্ভ থেকে হাজার হাজার গজ দূরে চীনের প্রাচীর, মাত্র কয়েক মিনিটে তারা এসে পড়লো লিফটে চেপে।

ফাংফা বললো—আমরা এবার চীনের প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করবো। চিংচু যে জায়গায় আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে কেউ কোনদিন যেতে পারেনা, যদি কেউ যায় সে বেরিয়ে আসতে পারেনা।

চিংচু বললো—আমার ভাগ্যে বেরিয়ে আসার সুযোগ আসবে কিনা কে জানে।

ভয় পাচ্ছো চিংচু?

মোটেই না।

সত্যি তুমি বড় সাহসী।

যত সামান্য।

চিংচু তোমাকে বিশ্বাস করি তাই আমি তোমাকে এই দুর্গম সুড়ঙ্গ পথে নিয়ে এসেছি। চীনের সমস্ত পুলিশ বাহিনী শত শত বছর সন্ধান চালিয়েও কোনদিন এ সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান পাবেনা। এই সুড়ঙ্গ পথ চীনের প্রাচীরের তলদেশ দিয়ে সোজা চলে গেছে প্রাচীরের মধ্য দেশে। সেখানে চীন দস্যু হামবার্টের গুহা। এখানে ত্রিরিশ জন দস্যু বাস করে আর......

বলুন ফাংফা রাজ থামলেন কেনো?

না, না এতো কথা কাউকে বলার নিয়ম নয়। যতটুকু বলছি তোমাকে বন্ধু লোক মনে করি তাই।

হাঁ আমাকে বন্ধু বলেই মনে করবেন এই আমি চাই। যা বললেন ফাংফা রাজ আমি তাই করবো। কিন্তু একটা দুঃখ আমাকে সব সময় ব্যথা কাতর করে তোলে যাক সে কথা চলুন কোথায় যেতে হবে বলুন?

বলো, বলো চিংচু থামলে কেনো?

না বললে আপনি আমাকে......একটু থেমে বললো চিংচু—আপনি যদি এই দূর্গের সম্রাট হতেন তাহলে মানাতো ভাল?

চিংচুর কথায় ফাংফার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন। একটু হেসে বললো—তুমি যা বলছো একথা আমার মনেও মাঝে মাঝে উদয় হয় বটে কিন্তু চিংচু তুমি জানোনা হামবার্ট কত বড় শক্তি মান ভয়ঙ্কর।

ও তাই আপনি ভয় পেয়ে চুপষে থাকলে বুঝি?

চুপসে ঠিক নয়......

কথা শেষ হয়না ফাংফার একজন ভয়ঙ্কর চেহারার লোক এসে অভিনয় ভঙ্গীতে ফাংফাকে অভিবাদন জানিয়ে বলে—চলুন, সম্রাট বাহাদুর আপনাদের দু'জনকে ডাকছেন।

চিংচু মনে মনে উচ্চারণ করে নিলো সম্রাট বাহাদুর। হামবার্ট সম্রাট বাহাদুর বনে গেছে। শয়তানটাকে এবার সায়েস্তা না করে ছাড়বোনা। জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করেছি এবার তোমার জীবন লীলা সাঙ্গ হবে হামবার্ট কিন্তু তার পূর্বে তোমার চক্ষু এবং রক্ত ব্যবসার ঘাটি কোথায় তা আমার জানতে হবে......

চিংচুর চিন্তা ধারায় বাধা পড়লো। ফাংফা বললো, এসো এবার সম্রাট বাহাদুরের কাছে যাই।

সম্মুখে একটা ছোট্ট লিফট্।

ফাংফা এবং চিংচু লিফ্টে উঠে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে লিফ্টখানা সাঁ সাঁ করে উপরের দিকে চলতে শুরু করলো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

চিংচু সহ ফাংফা পৌছে গেলো অদ্ভুত এক স্থানে। চারিদিকে জমকালো এবড়ো থেবড়ো পাথুরে দেয়াল। বিরাট উঁচু ছাদ। সহসা ছাদখানা নজরে আসে না। দেয়ালের কোণ ফুটোর মধ্য দিয়ে তীব্র আলোর রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে সেখানে।

অদ্ভুত এক পরিবেশ।

চিংচুর দৃষ্টি পড়লো সম্মুখে।

একটা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আছে তার অতি পরিচিত এক পা খাটো সেই ভয়ঙ্কর নর শয়তান হামবার্ট। দু'চোখে তার অগ্নি ঝরছে যেন।

চিংচু তাকিয়ে আছে, ভুলে গেছে সে তাকে অভিবাদনের কথা কারণ তার মনে একটা ভীষণ প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে। শয়তান তার কাছ থেকে পালিয়ে একেবারে চলে এসেছে জিংহায়।

জিহাংহাকে চীনবাসীরা সংক্ষেপে জিংহা বলে উচ্চারণ করে থাকে ফাংফা বা দস্যু বনহুর নিজেও এই শব্দ ব্যবহার করে।

চিংচুকে লক্ষ্য করে ফাংফা বলে উঠলো—এনি আমাদের সম্রাট বাহাদুর......

চিংচুর সম্বিৎ ফিরে আসে। একটা শব্দ উচ্চারণ করে —ও মাফ করো—কথাটা বলে ফাংফা যে ভাবে হামবার্টকে অভিবাদন জানালো সেই ভাবে সেও তাকে অভিবাদন করলো।

হামবার্ট বললো—এই সেই চিংচু?

ফাংফা পুনরায় অভিবাদন জানিয়ে বললো—হাঁ সম্রাট, এই সেই চিংচু। এর চাচা হুয়াংচু চীনের সবচেয়ে বড় যাদুকর।

চিংচু এবার তাকিয়ে ফাংফাকে দেখে নিলো কারণ তার মুখে চিংচুর সম্বন্ধে আরও একটা পরিচয় সে নতুন করে শুনলো।

হামবার্ট বললো—চিংচু তোমাকে এখানে কেন আনা হয়েছে এখনও জানো না। শোন চিংচু একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।

বলুন সম্রাট?

তোমার চাচা যাদুকর হুয়াংচুকে আমার প্রয়োজন। যত টাকা চাও তোমাকে দেবো, পারবে তাকে আনতে? কথাগুলো বলে থামলো হামবার্ট।

চিংচুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো যেন। যা সে চেয়েছিলো তাই সে পেলো, বললো—টাকা পয়সা পরের কথা আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। কিন্তু কি প্রয়োজনে আমার চাচাকে—তা তো বললেন না? কারণ আমি তাকে বলতে গেলেই তিনি জিজ্ঞাসা করবেন সব কথা?

চিংচুর কথায় বললো হামবার্ট—তুমি অতি বুদ্ধিমান সুচতুর লোক দেখছি। তাকে যা বলতে হয় সাক্ষাতে বলবো তোমাকে নয়।

তাহলে আপনার কথা মত কাজ করা আমার হচ্ছে না কারণ আমার চাচা অত্যন্ত সুচতুর বুদ্ধিমান। আপনি এখানে তার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কথা বলছেন কিন্তু আমার চাচা তার যাদুর আসনে বসে সব জানতে পারছেন। এমন কি আপনি যে কারণে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করেছেন তাও তিনি যাদু মন্ত্র বলে জানতে পারছেন কাজেই আমাকে বললে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না সম্রাট।

বেশ শোন তবে চিংচু। ফাংফা আমার জিংহা দুর্গের প্রধান সহচর। ফাংফাকে আমি বেশি বিশ্বাস করি। কাজেই তুমি তারই পরিচিত জন। মনে রেখো যদি এর এক বর্ণ কথা বাহিরে প্রকাশ পায় তাহলে তোমার ঘাড়ে মাথা থাকবে না তাছাড়া......তাকালো হামবার্ট ফাংফার দিকে—ওর মাথাটাও যাবে তার সঙ্গে।

হাতের মধ্যে হাত কচলায় চিংচু—এ কথা আমার জানা আছে সম্রাট। এক চুল আমি কাউকে বলবো না। এই আমি নাক কান স্পর্শ করে শপথ করছি।

হামবার্ট বললো এবার—শোন তাহলে যাদুকর হুয়াংচুকে আমার কি প্রয়োজন বলছি।

বলুন সম্রাট, বলুন?

কান্দাই-এর নাম শুনেছো?

শুনেছি।

কান্দাই শহরে এক দস্যু আছে পৃথিবীর কোন দস্যুর তুলনা হয় না তার সঙ্গে—জানো সে দস্যু কে?

সম্রাট আমি কি করে জানবো?

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দস্যু নাম তুমি জানো না?

সম্রাট আমরা আপনাকেই তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দস্যু হিসাবে জানি। আপনি ছাড়া আর যে কেউ আছে তাতো জানি না।

আমি তো সবার চেয়ে বড় কিন্তু...

বলুন সম্রাট, থামলেন কেনো বলুন?

সে আমাকেও নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে।

সম্রাট।

হাঁ চিংচু। আমার সারাটা জীবনের তপস্যা সে বিনষ্ট করে দিয়েছে। আমার জঙ্গল বাড়ি ঘাটি সে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। আমাকে সে হত্যা করতে চেয়ে ছিলো কিন্তু ভাগ্যক্রমে পারেনি।

চিংচু দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে শুয়ে যাচ্ছিলো। অস্ফুট কণ্ঠে বললো—আপনাকেও সে হত্যা করতে চেয়েছিলো?

হাঁ চিংচু।

এতো বড় সাহস তার?

শুধু সাহস নয় সে দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর......

সম্রাট আপনার চেয়েও কি?

হাঁ চিংচু, তুমি তাকে দেখোনি জানোনা। আমি সেই দুর্দমনীয় দস্যুকে দমন করতে চাই। শক্তির দ্বারা আমি যাকে কাবু করতে পারিনি তাকে কাবু

করতে চাই যাদু বলে। হাঃ হাঃ হাঃ হামবার্টের সাধনা বিনষ্ট করে সে পৃথিবীর বুকে আজও বেঁচে থাকবে......এ আমি হতে দেবোনা।

সম্রাট এখন আমি সব অবগত হলাম।

হামবার্ট এক গাদা টাকা বের করে চিংচুর হাতে দিয়ে বলে—এই নাও তোমার বখশীস। তোমার চাচার দ্বারা কাজ উদ্ধার হলে আমি তোমাকে আরও দেবো। আর তোমার চাচার জন্য রইলো আমার চীন প্রাচীর দুর্গের ধনাগার। ফাংফা যাও একে পুনঃরায় এর জাগায় পৌছে দিয়ে এসো। হাঁ মনে রেখো চিংচুর সব কথা যেন গোপন থাকে।

ফাংফা এতোক্ষণ নীরবে এক পাশে নত মস্তকে দাঁড়িয়েছিলো এবার সে মাথা কাৎ করে বললো—নিশ্চয়ই থাকবে।

যাও ওকে নিয়ে যাও তাহলে।

এসো চিংচু।

চিংচু ফাংফার অনুকরণে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

❑

চিংচু একাই বসে বসে নেশা পান করছিলো। হোটেলের কক্ষ সম্পূর্ণ জন শূন্য নীরব। হোটেলের বয়গণ কে কোথায় নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত।

হুংমাও নেই তখন, সে হয়তো কোথায় গেছে কে জানে।

দস্যু বনহুর এসে বসলো চিংচুর পাশের চেয়ারে। আংগুলের ফাঁকে তার সিগারেট রয়েছে। সিগারেট থেকে ধুম্র শিখা ধীরে ধীরে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে পিউলপাং-এর মৃদু মন্দ বাতাসে। হোটেলের মধ্যে একটা শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছিলো।

বনহুর বাম হাতখানা রাখলো চিংচুর কাঁধে।

চিংচু তার নেশা জড়িত চোখ দুটো তুলে তাকালো বনহুরে দিকে—তুমি!

হাঁ আমি রাজা।

রাজা তুমি নেশা খাবেনা?

খেয়েছি।

খেয়েছো?

হাঁ।

বেশ বেশ তুমি অনেক ভাল লোক কিন্তু।

তুমিও খুব ভাল চিংচু। আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি।

সত্যি বলছো রাজা?

সত্যি তুমি আমার অনেক প্রিয়? এ হোটেলে আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি তেমন আর কাউকে নয়।

সত্যি!

বললাম তো সত্যি।

হুংমাকে?

তোমার মত নয়।

রাজা! চিংচু রাজাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে। চোখ দুটো তার নেশায় ঢুলূ ঢুলূ করছিলো একবার বড় হয়ে আবার ধীরে ধীরে মুদে আসে।

বনহুর তার আঙ্গুলের ফাঁক থেকে সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে পায়ের জুতো দিয়ে পিষে চাপা কণ্ঠে বলে—চিংচু আমি একটা বিপদে পড়েছি।

বিপদ? নেশাভরা চোখ দুটো তুলে ধরে চিংচু বনহুরের মুখে।

বনহুর বলে—খুব বিপদ মানে আমার পিছনে একটা শত্রু লেগেছে, সে আমাকে হত্যা করতে চায়। চিংচু শুনেছি তোমার চাচা মস্তবড় যাদুকর তাই.....

হাঁ, এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে? এ হোটেলে কেউ জানে না আমি কে?

তুমি কে তা কেউ জানেনা?

না। শুধু তুমিই জানো দেখছি। কিন্তু কি করে তুমি জানতে পারলে আমার চাচা মস্ত বড় যাদুকর?

আমি নিজেও একটু একটু যাদু বিদ্যা চর্চা করছি কিনা তাই...

ও বুঝেছি। হাঁ আমার চাচা খুব বড় যাদুকর। চীন দেশে তার মত যাদুকর আর দ্বিতীয় জন নাই। তার নাম.....

নাম হুয়াংচু।

তুমি তার নামও জানো রাজা?

সব জানি।

আমার চাচা হুয়াংচূর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

পরিচয় হয়নি এই যা দুঃখ। চিংচু পারবে তুমি তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে?

সর্বনাশ!

কেনো?

কেউ তার সম্মুখে যেতে পারে না।

সে কি রকম?

আমার চাচার নিঃশ্বাসে আগুন ঝরে।

আগুন!

হাঁ, আগুন বের হয় তার নিশ্বাসে। কেউ তার সামনে যেতে পারে না।
তুমি যেতে পারো না চিংচু?
পারি কিন্তু অনেক কষ্টে।
আমিও যাবো তোমার মত কষ্ট করে।
কিন্তু আমার সাহস হচ্ছে না, যদি তোমাকে সে যাদুর দ্বারা জানোয়ার বানিয়ে ফেলে বা পাথরের মূর্তি বানিয়ে দেয়।
সে তো আমার খুব আনন্দের কথা। চিংচু তোমার চাচা মানুষকে জানোয়ার বানাতে পারে?
হাঁ। কত বানিয়েছে সে।
মানুষকে পাথরও বানায় বুঝি?
অনেক অনেক মানুষ আজ চাচার যাদু গুহায় পাথরের মূর্তি বনে আছে।
সত্যি! বনহুরের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে।
বলে চিংচু—হাঁ, সত্যি বলছি।
আমাকে তুমি নিয়ে যাবে তো?
কিন্তু!
কোন কিন্তু নয় চিংচু, তুমি যা চাইবে তাই দিবো।
দেবে? তাই দেবে?
দেবো।
হুংমার ভালবাসা ত্যাগ করতে পারবে?
এবার বনহুর অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লো।
অবাক হয়ে গেলো চিংচু, এর পূর্বে সে কাউকে অমন করে হাসতে দেখেনি। অদ্ভুত সে হাসি বড় সুন্দর, বড় অপূর্ব। হাসি থামিয়ে বললো বনহুর—হুংমাকে আমি ভালবাসি এ কথা কে তোমাকে বললো চিংচু?
এ হোটেলের সবাই জানে।
তাদের সঙ্গে তুমিও কেমন?
হাঁ সবাই জানে আমিও জানি। হুংমা নিজেও বলে তুমি তাকে ভালবাসো।
হুঁ বাসি।
সে জন্যই বলছি তুমি যদি হুংমার ভালবাসা ত্যাগ করে তাকে আমার হাতে সপে দাও তাহলে তুমি যা বলবে তাই করবো। আমার চাচার কাছে নিয়ে যাবো।
নিশ্চয়ই হুংমার ভালবাসা ত্যাগ করবো।
বেশ আমিও তোমাকে আমার চাচার কাছে নিয়ে যাবো।

বনহুরকে কথা দিয়ে চিংচু ভাবনায় পড়ে গেলো কারণ চিংচু জানে তার চাচার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা মানে যমদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ, তবু চিংচু চেষ্টা করবে বলে আশ্বাস দিলো বনহুরকে।

বনহুর অবশ্য চিংচুর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলো কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিলো তত সহজ নয়।

চিংচু দু'দিনের ছুটি নিয়ে চলে গেলো চাচার সাথে দেখা করতে। যাবার সময় বনহুরকে কথা দিয়ে গেলো ফিরে এসেই নিয়ে যাবে। সঙ্গে করে।

চিংচু চলে যাবার পর একদিন কাটলো দু'দিন কাটলো চিংচুর পাত্তা নেই। বনহুর বাইরে গেলেও সকাল সকাল ফিরে আসে, না জানি কখন চিংচু এসে পড়বে।

অবশ্য ইচ্ছা করলে বনহুর তাকে অনুসরণ করে চলে যেতে পারতো— চিংচু জানতেই পারতো না। বনহুর তা করেনি। অবশ্য তার কারণ ছিলো, প্রথম চিংচু ফিরে এসে কি বলে দেখতে চায় সে।

এ দু'দিন হুংমা ওর কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলো যার জন্য বনহুর কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলো। না হলে প্রায়ই হুংমার ছেলেমিভরা আব্দার তাকে অস্থির করে তুলতো। মাঝে মাঝে বনহুর বিরক্ত না হয়ে পারতো না। অতি সাবধানে তাই এড়িয়ে চলতো বনহুর ওকে।

হুংমা কিন্তু বনহুরের মনোভাব মোটেই বুঝতে পারতোনা। সে মনে করতো—ও না এলেই বুঝি রাজা রাগ করে তাই একটু কোথাও গেলে ফিরে এসে বিনা সঙ্কোচে জড়িয়ে ধরতো বনহুরের গলাটা।

শঙ্খ শুভ্র বাহু দুটির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বনহুর বিরক্ত বোধ না করলেও •বিব্রত বোধ করতো।

বলতো বনহুর—হুংমা তুমি এতো ছেলে মানুষ। কিছু বোঝনা—আমি তো তোমাদের দেশের লোক নই।

বলতো হুংমা—নাই বা দেশের মানুষ তোমাকে আমি ভালবাসি রাজা।

বনহুর পারতো না কোন জবাব দিতে।

বলতো হুংমা—রাজা, কই তুমি তো আমায় চুমু দিলে না? তোমার সুন্দর দুটো ঠোঁট, চিবুক, চোখ, কপাল...হুংমা ধীরে ধীরে হাত বুলায় বনহুরের মুখমণ্ডলে।

সরিয়ে দিতে পারে না বনহুর ওকে।

পরিবেশটা স্বাভাবিক করার জন্য বলে বনহুর—হুংমা, তুমি নেশা কেনো পান করো তাতো সেদিন বললে না?

হুংমা ক্রমান্বয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে একটু ভেবে বলে— সেদিন আমি তো তোমাকে সব বলেছি রাজা। হাঁ ঐ কথাটা সেদিন বলি বলি করেও বলা

হয়নি। বাবার কথায় যখন অবাধ্য হয়ে পড়ি, বাবার হোটেলের খদ্দেরদের যখন খুশি করতে যাইনা তখন বাবা আমাকে নেশা পান করায়।

নেশা পান করায় তোমাকে?

হাঁ রাজা, যেন আমি বাবার কথা শুনি। মানে সংজ্ঞা হারিয়ে যা খুশি তাই করি। কিন্তু কি জানো—আমি খুব চালাক মেয়ে। আমি কোনদিন ওদের নাগালের মধ্যে যাইনি। একটু হেসে বলে আবার হুংমা—ওরা আমাকে খুব বোকা মনে করে আমি যেন ওদের নাচের পুতুল। ওরা আমাকে যে ভাবে নাচাবে আমি তাই নাচবো।

হুংমা!

হাঁ রাজা, আমি বড্ড হুসিয়ার। সবাই আমাকে ধরতে চায় কিন্তু আমি ওদের নাগালের বাইরে।

তবে আমার কাছে তুমি নিজকে এ ভাবে....

হুংমা বনহুরের মুখে হাত চাপা দেয়—রাজা আমি শুধু তোমার হতে চাই। তুমি আমাকে ভালবাসো না?

বলেছি তো বাসি।

তবে চুমু দাও না কেনো?

হুংমা যদি খুশি হও বেশ.....

না, হুংমাকে তুমি পাবে না রাজা। হুংমা আমাদের। সুতীক্ষ ধার ছোরা নিয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় হিয়ংচু।

বনহুর যেমন অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে ছিলো তেমনি থাকে। এক চুল সে নড়েনা বা হিয়ংচুর হাতে ছোরা দেখে তার চোখে মুখে ভীত ভাব ফুটে উঠেনা।

হুংমা ততক্ষণে সোজা হয়ে বসেছে, উঠে দাঁড়ায় সে ধীরে ধীরে।

হিয়ংচু বললো—রাজা, সেদিন খালি হাতে ছিলাম তাই আমাদের এতোগুলোকে কাবু করেছিলো—আজ, আজ কেমন করে তুমি রক্ষা পাবে?

বনহুর অতি স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়ালো তারপর বললো— সেদিন যেমন করে পেয়েছিলাম।

ও তুমি দেখছি ছোরা দেখেও ভয় পাওনি?

মোটেই না।

সত্যি বলছো?

হাঁ।

হুংমা সরে যাও আমি আজ রাজাকে খতম করবো।

না, না আমি রাজাকে হত্যা করতে দেবোনা ওকে আমি রক্ষা করবো। হুংমা ভয় বিহবল কণ্ঠে কথাগুলো বললো।

হিয়ংচূ হেসে উঠলো—তোমার জন্যই ওকে মরতে হলো। ও জানে—তুমি আমাদের সবার তবু সে একা তোমাকে পেতে চায়। বনহুরের ভ্রুজোড়া কুঁচকে উঠলো শুধু কোন কথা সে বললো না। প্রতিক্ষা করতে লাগলো। যে মুহূর্তে হিয়ংচু আক্রমণ চালাবে তখন সে তার পাল্টা জবাব দেবে।

হিয়ংচু বললো—হুংমা সরে যাও।

না।

হুংমা।

আমি তোমাকে ভয় করিনা হিয়ংচু।

তাই নাকি?

হাঁ, তোমার মত কুকুরকে আমি ঘৃণা করি।

হুংমা, এত্তো বড় সাহস তোমার—সঙ্গে সঙ্গে হুংমাকে টেনে নিয়ে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে যায় হিয়ংচু।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে হুংমার বুকে ছোরাখানা বসিয়ে দেবার পূর্বেই ছোরা সহ হিয়ংচুর হাতখানা ধরে ফেলে। তারপর কঠিনভাবে চাপ দিতেই ছোরাখানা খসে পড়ে ভূতলে। অমনি প্রচণ্ড এক ঘুষি। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় সে ছোরাখানার পাশে।

বনহুর ওর পিছনের ঘাড়ের জামা ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়—পর পরই লাগায় আরও একটা ঘুষি।

এবার হিয়ংচু পড়ে যায় দেয়ালের উপর।

ঝাঁকুনি খেয়ে সমস্ত ঘরখানা থর থর করে দুলে উঠে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে।

যেমন সে পুনরায় উঠে দাঁড়িয়েছে অমনি আবার লাগায় ঘুষি। নাকমুখ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে হিয়ংচুর। সে উবু হয়ে ছোরাখানা হাতে তুলে নিতে যায় কিন্তু বনহুর একখানা পা তুলে দেয় ছোরাটার উপর।

হিয়ংচুর নাজেহাল অবস্থা।

ছোরা নিতে না পেরে পালাতে যাচ্ছিলো।

বনহুর পিছন থেকে চেপে ধরলো ওর গলার পাশের জামার অংশ তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো—খেয়াল রেখো হিয়ংচু আজকের কথাটা।

ছেড়ে দেয় বনহুর ওকে।

হিয়ংচু টলতে টলতে বেরিয়ে যায়।

ভীষণ রাগ হয় ওর তবু হিয়ংচু আজ কারো সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনা লজ্জায় কুঁকড়ে গেছে সে আজ আবার নতুন করে।

বনহুর ভেবেছিলো হিয়ংচু তার কাছে মার খেয়ে আবার গিয়ে হুংমার বাবার কাছে যা-তা লাগাবে। হয়তো বা প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে তার উপর কিন্তু আশ্চর্য হিয়ংচু সেদিনের পর থেকে যেন সাধু বনে গেলো একেবারে।

বনহুরকে দেখলেই ও দূর থেকে আলগোছে সরে পড়ে। হঠাৎ যদি মুখোমুখি হয়ে যায় তবে মাথা নিচু করে এক পাশে দাঁড়ায়, বনহুর চলে গেলে সে যায়। যেন শিক্ষক আর ছাত্র।

বনহুর হিয়ংচুর আচরণে মনে মনে হাসে।

হুংমা বলে—দেখলে তো রাজা হিয়ংচু তোমার কাছে হেরে গিয়ে কেমন বোকা বনে গেছে। আর কোনদিন সে তোমাকে কাবু করার চেষ্টা করবেনা। সত্যি রাজা তুমি বীর পুরুষ!

হুংমার কথায় মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে বনহুরের মুখে। বলে সে—এই সামান্য ব্যাপারে আমার প্রতি তোমার একটা বিরাট বিশ্বাস এনে দিয়েছে হুংমা। আসলে ও কিছু নয়। আমার চেয়ে ও অনেক বীর পুরুষ।

তুমি যে কি বলো রাজা। আমি তো নিজের চোখে দেখলাম হিয়ংচুকে তুমি কেমন নাজেহাল করে ফেললে। বীর পুরুষই শুধু নও তুমি অসীম শক্তিশালী।

তুমি যা বলছো না হয় তাই। বেশ এখন যাও হুংমা আমি এখন কাজে যাবো।

আমি থাকলে তোমার অসুবিধা হয় বুঝি?

না।

তবে যেতে বলছো কেনো?

হুংমা তোমার বাবা এবং তোমার বন্ধু বান্ধব যা ভালবাসেনা তা করোনা। আমি জানি ওরা তোমাকে আমার পাশে দেখতে চায়না।

ওরা কি চায় না চায় আমিও দেখতে চাই না, শুনতেও চাইনা। রাজা....হুংমা দু'হাতে বনহুরের গলাটা বেষ্টন করে ধরে বলে—তুমি, আমার হবে রাজা? বলো, বলো রাজা তুমি শুধু আমার হবে?

এক টুকরা হাসির আভাস ফুটে উঠে বনহুরের ঠোঁটের কোণে—আমি তো তোমাদের সবার জন্য হুংমা। তোমরা আমাকে যে যা বলবে আমি তাই করবো কিন্তু অন্যায় কিছু বললে বা করলে আমি তাকে সায়েস্তা করবো। যেমন হিয়ংচুকে আমি তার কাজের জন্য উচিৎ শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি।

সত্যি রাজা, তোমাকে বাহবা দিতে হয়। কিন্তু তুমি সবার জন্য নও। শুধু আমার.....

আরও গভীরভাবে হুংমা বনহুরের গলাটা আঁকড়ে ধরে।

বনহুর আলগোছে ওর হাত দু'খানাকে গলা থেকে মুক্ত করে নিয়ে বলে—বেশ, তুমি যা বলবে তাই হবে—আমি শুধু তোমারই থাকবো।

রাজা আমার ক'জন বান্ধবী আছে মাঝে মাঝে ওরা আমার বাবার হোটেলে আসে। তোমাকে ওরা দেখলে এক দম ছাড়বে না, ওরা তোমাকে নিয়ে যাবে। রাজা তুমি চলে যাবেনা তো?

না না তাকি যাই। তাদের কাউকে চিনিনা শুনিনা, আমাকে নিয়ে যেতে চাইলেই যাবো নাকি।

সত্যি যাবে না?

না।

ওরা অনেক দিন আসেনি ঠিক্ দু'চার দিনের মধ্যে এসে পড়বে। বড় খারাপ মেয়ে ওরা, ভাল লোক দেখলে নিয়ে যায়।

অবাক হবার ভান করে বলে বনহুর—ভাল লোক দেখলে নিয়ে যায় বলো কি হুংমা!

হাঁ।

কোথায় নিয়ে যায়?

কেনো ওদের হোটেলে।

তোমার বান্ধবীদের সবার হোটেল আছে?

থাকবেনা, ওরা যে সবাই হোটেল ওয়ালার মেয়ে তাই ওদের হোটেল আছে।

লোকগুলোই বা কেমন—যে নিয়ে গেলো আর তারা গেলো?

চীন দেশে একা নিয়ম।

কেমন?

পুরুষদের চেয়ে এখানে মেয়েদের অধিকার বেশি। যে মেয়ের কাছে যে পুরুষকে ভাল লাগবে তাকেই সে বিয়ে করতে পারবে।

আর পুরুষদের যদি কোন মেয়েকে ভাল লাগে—যেমন ধরো তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, তোমাকে কি আমি বিয়ে করতে পারিনা?

এবার হুংমার মুখ ম্লান হলো, বললো—বলেছিতো পুরুষদের বেলায় ভাল লাগার কোন দাম নেই এ দেশে। রাজা যদি পুরুষদের ভাল লাগার দাম থাকতো তাহলে কবে হিয়ংচু আমাকে বিয়ে করে ফেলতো। চিংচুরও ইচ্ছা ছিলো কিন্তু ওরা কেউ আমাকে বিয়ে করবে এ কথা বলতে পারেনা।

তাহলে তোমার ইচ্ছাই ইচ্ছা কেমন?

হাঁ।

তুমি এতোদিন বিয়ে করোনি কেনো হুংমা?

বলেছি তো কাউকে আমার পছন্দ হয়না। কাউকে আমি কেয়ারও করিনা শুধু বাবার হোটেল চালু থাকার জন্য যা করি তা তো তুমি সব জানোই রাজা।

হাঁ জানি।

সব তোমাকে বলেছি..... একটু থেমে বলে হুংমা—আমার বাবার বন্ধুর মেয়েরা মানে আমারও বান্ধবী তারা, ওরা আসে যাকে পছন্দ হয় নিয়ে যায়।

তুমি কিছু বলো না?

ঠোঁট উল্টে বলে হুংমা—ওদের নিয়ে গেলে আমার বয়েই গেলো। এক জনকেও আমি পছন্দ করিনি।

এক জনকেও না?

না। সব যেন কেমন বিশ্রি শুধু তুমি ছাড়া। তাই তো আমি তোমাকে নিয়ে এতো ভাবনায় পড়েছি।

তার জন্য হুংমার ভাবনা দেখে ভাবনায় পড়ে যেন বনহুর। এতো ছেলে মানুষ হুংমা, ওকে দেখলে ওর কথাবার্তা শুনলে মায়া হয়। যেমন নীলার জন্য মায়া হতো তার। হুংমা শিক্ষাহীন আর নীলা ছিলো শিক্ষিতা তবু এদের উভয়ের মধ্যে নেই কোন পার্থক্য। হুংমাও যেমন তেমনি ছিলো নীলা, দু'জনাই অবুঝ।

শুধু নীলা আর হুংমাই নয় এমনি কত অবুঝ মুখ ভেসে উঠতে লাগলো বনহুরের মনের পর্দায়, এদের কথা মনে হলে হাসি পাওয়ার চেয়ে দুঃখ পায় সে বেশি। ওরা সরল সহজ মন নিয়ে তাকে ভালবাসে, তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে কিন্তু সে তো কোনদিন পারেনি ওদের ভালবাসতে বা গ্রহণ করতে তবে মাঝে মাঝে সে বিচলিত হয়েছে। ধৈর্যচ্যুতিও ঘটেছে তার কিন্তু সংযম সে হারায় নি কোনদিন, সংযম তাকে সংযত রেখেছে। জীবনে সে একটি মেয়েকেই ভাল বেসেছিলো সে হলো মনিরা। নূরী ছিলো তার ছোট বেলার সাথী ওকে বনহুর স্নেহ করতো। নূরী যে কখন নিজের অজান্তে তাকে ভালবেসে ফেলেছিলো সে জানতো না— জানতে পেরেছিলো অনেক পরে যখন বনহুর মনিরার কাছে নিজকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলো তখন।

বমহুর যখন জানতে পারলো নূরী তাকে ছাড়া কাউকে বোঝেনা, কাউকে সে চায়না—এমন কি তাকে ছাড়াও নিজকে বিসর্জন দেবে তখন সে নূরীকে নিয়ে চিন্তা করেছিলো, তার আগে কোনদিন নূরীকে নিয়ে বনহুর ভাবেনি।

নূরী তার মনে আলোড়ন জাগালেও সে কোনদিন ভাবেনি ওকে সে বিয়ে করবে বা বিয়ে করতে পারবে তবু একদিন এমন এক মুহূর্ত এসেছিলো যেদিন সে তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলো। রহমান তার কর্তব্যের

দিকটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলো, সর্দার নূরীই আপনার দস্যু জীবনের প্রথম উৎস, ওকে আপনি বিমুখ করবেন না।

সেদিন রহমানের কথা ফেলতে পারেনি বনহুর। গভীরভাবে তলিয়ে দেখেছিলো রহমানের কথা মিথ্যা নয়। নূরীই তার দস্যু জীবনের প্রথম সঙ্গিনী সহচরী বান্ধবী। সেই শিশুকাল থেকে এতো বড় পর্যন্ত কত ঘটনা মনে পড়েছিলো সেদিন, মনে পড়েছিলো বহু স্মৃতি যে স্মৃতিগুলোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়েছিলো নূরী, তাই পারেনি বনহুর নূরীকে বিমুখ করতে। কতকটা সে বাধ্য হয়েই বিয়ে করেছিলো নূরীকে।

অবশ্য নূরীর ভালবাসা মনিরার চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না। শিশুকাল থেকেই নূরী মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ছিলো বনহুরকে! সে ভালবাসা ছিলো পবিত্র নির্মল, ফুলের সুবাসের মত স্নিগ্ধ।

যদিও বনহুর কোনদিন নূরীর মনের দিকে তাকিয়ে দেখেনি কিংবা ওকে বুঝতে চেষ্টা করেনি তবু নূরী ওকে ভালবেসে গেছে প্রাণের চেয়েও বেশি। বহুদিন বনহুর ওকে উপেক্ষা করেছে, অবহেলা করেছে তবু নূরীর ভালবাসায় এতোটুকু শিথিলতা সে দেখেনি বা দেখতে পায়নি। মনিরার মধ্যে মাঝে মাঝে তবু রাগ অভিমান সে দেখেছে কিন্তু নূরীর মধ্যে সে কোনদিন দেখেনি এতোটুকু গাম্ভীর্য। সদা হাস্যময়ী নূরী আর মনিরা আদর্শবতী নারী। বনহুরের জীবনে এ দুটি মেয়ে ঠিক দু'দিক নিয়ে এসেছে। হয়তো বা প্রয়োজনও ছিলো এদের দু'জনার।

বনহুরের জীবন ছিলো বৈচিত্রময়ে ভরা সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না ও মোহ এ সব যদিও তাকে কোনদিন বিচলিত করতে পারেনি তবু কোন কোন সময় বনহুর ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়তো। তখন নূরীর সান্নিধ্যতার নিত্যান্ত প্রয়োজন হতো। ঝর্ণার মত চঞ্চলা নূরী তখন বনহুরের জীবনকে আনন্দ মুখর করে তোলার চেষ্টা করতো। আর যখন বনহুর খুশিতে উচ্ছল থাকতো তখন মনিরার পাশে ছুটে যেতো এক বুক আনন্দ নিয়ে। মনিরার অভিমান ভরা মুখখানা, ওর বড় ভাল লাগতো—ভাল লাগতো ওর অশ্রু সিক্ত দুটি চোখ। যে চোখের চাহনী তাকে অভিভূতই শুধু করতো না আত্মহারা করতো। কাজেই বনহুরের জীবনে নূরী আর মনিরা অভিশাপ নয় আশির্বাদ।

হঠাৎ বনহুরের চিন্তা ধারায় বাধা পড়ে। হুংমা সোজা হয়ে বসে বলে—চলো না রাজা, আজ মিনা বাজারে যাই?

মিনা বাজার!

হাঁ বড় সুন্দর এই মিনা বাজার।

মিনা বাজারে তো শুধু মেয়েরাই যায়।

না, চীনা দেশের মিনা বাজারে পুরুষগণও যায়। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

বেশ যাবো। যাও তৈরি হয়ে এসো গে হুংমা। আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

হুংমা খুশি হয়ে বেরিয়ে যায়।

কয়েক মিনিট পরে ফিরে আসে হুংমা।

অবাক চোখে তাকায় বনহুর ওর দিকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—আজ হুংমার শরীরে নতুন ড্রেস। চীনা মেয়েদের পোশাক শোভা পাচ্ছে তার শরীরে।

বনহুর বললো—চমৎকার।

হুংমা হেসে বললো—কেমন লাগছে আমাকে?

বললাম তো চমৎকার।

হুংমাকে বনহুর কোনদিন এ পোশাকে দেখেনি, সত্যি বড় সুন্দর লাগছে ওকে।

হুংমা বললো—চলো রাজা, দেরী করছো কেন?

হাঁ, চলো।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

হুংমা বললো—কই তুমি পোশাক পাল্টে নাওনি তো?

আমার এই পোশাকেই চলবে। নিজের শরীরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেয় বনহুর।

হুংমা ওর হাত ধরে বলে—চলো তাহলে।

এক রকম প্রায় টেনেই নিয়ে চলে হুংমা বনহুরকে।

কাঠের সিড়ি বেয়ে নেমে যায় ওরা দু'জন।

একটা এক্কা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে উঠে বসে হুংমা। হাত বাড়িয়ে বলে সে—এসো রাজা।

রাজা ওর হাতে হাত রেখে এক লাপে এক্কায় উঠে বসে।

এক্কা ছুটতে শুরু করে।

অল্পক্ষণেই অসমতল কাঁকড় বিছানো পথ পেরিয়ে মসৃণ রাজপথে গাড়িখানা এসে পড়ে। পথের দু'ধারে সুউচ্চ প্রাসাদ সমতুল্য অট্টালিকা। নানা রকম চাকচিক্যে ভরা দেয়ালগুলো অতি মনোরম। অগণিত গাড়ি ঘোড়ার পাশ কাটিয়ে ছুটে চলেছে এক্কাখানা।

বনহুর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো চারিদিক। পূর্বে কখনও চীন শহরে আসেনি তাই যত দেখে সে তত অবাক হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় জিহাংহা সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। বাড়ি ঘরগুলোও আশ্চর্য গড়নে তৈরি। বেশির ভাগ বাড়িঘর বা দোকান পাটের দেয়ালে নানা ধরণের নক্সা

আঁকা রয়েছে। কোন দেয়ালে হাতী, ঘোড়া বা জিরাফ, কোন দেয়ালে বাঘ ভল্লুক, সিংহ, কোন দেয়ালে মানুষের ছবি। সামুদ্রিক জীবও গাছ গাছড়ার ছবিও বহু রয়েছে। বনহুর অবাক হয়ে এ সব দেখে।

এক সময় মিনা বাজার গেটে পৌঁছে যায় এক্কা গাড়িখানা।

বনহুর দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে দেখছে।

মিনা বাজারের গেটখানা অদ্ভুতভাবে তৈরি। গেটের উপরে ভয়ঙ্কর একটা জীবের ফটো। বিরাট হাঁ মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর গাড়ি থেকে নেমেই দু'চোখ বিস্ফোরিত করে তাকালো ভয়ঙ্কর জীবটার ফটোর দিকে। জীবনে বনহুর বহু জীব দেখেছে এমন কি পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কিউকিলা তার সঙ্গে সে যুদ্ধও করেছে। কিন্তু এ কি ধরণের জীব ভেবে পায়না সে।

বলে হুংমা—কি দেখছো রাজা?

ঐ জীবটাকে।

ও তুমি চেনোনা বুঝি? ও জীবটা হলো আমাদের দেবতা।

দেবতা?

হাঁ আমরা ওকে পূজা করি।

একটা অদ্ভুত জীবকে তোমরা দেবতা বলে মানো আবার তাকে পূজা করো?

রাজা তুমি জানোনা—কত বড় দেবতা ও আমাদের। চীন যাদুকর হুয়াংচুর মেয়ে মাদামচিং এর দেবতা সে।

তাই তোমাদেরও দেবতা কেমন?

হাঁ। আমরা সবাই তার পূজা করি।

ও জীবটা কোথায় থাকে?

চীন পর্বতের গুহায়।

চীন পর্বতের গুহায় থাকে জীবটা?

হাঁ।

সে কি করে যাদুকর হুয়াংচুর মেয়ে মাদামচিং-এর দেবতা হলো?

সে এক অদ্ভুত কাহিনী। পরে এক দিন তোমাকে সব কথা বলবো।

আচ্ছা, তাই বলো।

তবে শুনে রাখো—যাদুকর হুয়াংচু ঐ কংঙ্গার পূজা করেই তাকে বাধ্য করেছে।

কংঙ্গা!

ঐ জীবটার নাম কংঙ্গা। চলো এখন আমরা মিনা বাজারের ভিতরে যাই।

চলো।
এগুলো বনহুর আর হুংমা।
এতো সুন্দর মীনা বাজার এর পূর্বে দেখেনি বনহুর। জিহাংহার মেয়েরা যে হাতের কাজ এতো সুন্দর করতে পরে নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয়না যেন।
মেয়েরা সব দোকান সাজিয়ে নিয়ে বসেছে। কেউ বা শুধু ফুলদানী। নানা রকম ফুলদানীতে নানারকম কারুকার্য খঁচিত। কতকগুলো মনি মুক্তা বসানো, হাতীর দাঁতে তৈরিও অনেক রয়েছে। কেউ বা পাখা নিয়ে দোকান সাজিয়েছে। নানা জাতীয় পাখা। বিচিত্র ধরণের নানা বর্ণের। কেউ বা মালা—ঝিনুকের পাথরের বহু রকমের। এমন কি হীরা বসানো মালাও রয়েছে সে সব দোকনে। কোন মেয়ের আংটীর দোকান—কত রকম যে আংটী সে দোকানে আছে তার ইয়ত্তা নেই।
শাড়ি ওড়না বা ঐ জাতীয় কাপড় চোপড় ছাড়া সব কিছুই আছে চীনা মেয়ে এবং পুরুষদের প্রয়োজনীয়।
হুংমা বললো—রাজা আমাকে একটা কিছু কিনে দেবেনা?
দেবো। বলো তুমি কি চাও?
হুংমা বললো—যা চাইবো তাই কিনে দেবো বলো কি চাও?
হুংমা এগিয়ে গেলো আংটীর দোকানের দিকে।
বনহুর ওকে অনুসরণ করলো।
হুংমা দোকানে গিয়ে আংটী দেখতে লাগলো। বনহুর ওর পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। হুংমা এক একটা আংটী আংগুলে পরে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে কোনটা তার আংগুলে হয়।
এমন সময় হঠাৎ চারিদিকে লোক জনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যতা পরিলক্ষিত হলো।
হুংমা আংটী রেখে বললো—রাজা শীগগীর চলো—শীগগীর চলো, যাদু সম্রাটের কন্যা মাদামচীং আসছে।
মাদাম চীং।
হাঁ ও যদি এসে পড়ে তা হলে আর রক্ষা নাই। তোমাকে সে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে।
আমাকে?
হাঁ।
কেনো?
তুমি যে সুন্দর তাই..... আর দেরী করোনা রাজা। হুংমা বনহুরের হাত ধরে দোকানের অপর দিকে টেনে নিয়ে চলে।

কিন্তু ঐ পথেই যাদুকর হুয়াংচুর কন্যা মাদামচীং তার পাহারাদারগণ সহ এগিয়ে আসছিলো।

হুংমার সংগী বনহুরকে সে দেখে ফেলে।

হুংমাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

মাদামচীং এর দিকে তাকিয়ে অবাক হয় বনহুর অদ্ভুত পোশাকে সজ্জিত ওর দেহ। কতকটা রাজ কন্যাদের মত। চাকচিক্যে ভরা মাথায় মুকুট আছে। বনহুর আরও অবাক হলো মেয়েটির মাথার মুকুটে সেই অদ্ভুত জীবটার ছবি।

মাদামচীং বললো—শোন

হুংমা বনহুরের দিকে করুণ ভয়াতুর চোখে তাকিয়ে বললো— রাজা, তোমাকে রক্ষা করতে পারলামনা। কম্পিত পা ফেলে এগিয়ে গেলো হুংমা মাদামচীং এর দিকে।

মাদামচীং বললো ওকে নিয়ে এসো।

হুংমা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলো পিছিয়ে এসে পুনরায় বনহুরের হাত ধরে বললো—এসো।

বনহুর আর হুংমা এসে দাঁড়ালো।

হুংমা অভিনবভাবে অভিবাদন জানালো মাদামচীংকে, দু'চোখে তার ভয় আর উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটিয়ে উঠেছে। একটু পূর্বে যে হুংমা আংটী কিনার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠেছিলো এখন সেই হুংমা তার রাজাকে যাদুকরি মাদামচীং এর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু হুংমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। মাদামচীং দু'চোখ বিস্ফারিত করে বনহুরকে দেখে নিয়ে বললো—তুমি এর মূল্য কত চাও বলো?

হুংমা প্রায় কেঁদে ফেলে বললো—ওকে আমি বিক্রি করবোনা মাদাম।

মুহূর্তে মাদামচীং এর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন দাঁতে দাঁত পিষে বললো—এ কথা বলতে সাহস হলো তোমার? তাকালো মাদামচীং তার সঙ্গে পাহারাদার দু'জনার দিকে—কি যেন ইংগিৎ করলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে মাদামচীং এর অনুচরদের দু'জন এগিয়ে এসে হুংমার দেহে তাদের হাতের ছড়ি দ্বারা আঘাত করলো।

হুংমা মাটিতে পড়ে গেলো।

পুনরায় আঘাত করতে যাচ্ছিলো একজন।

বনহুর ওর হাতের চাবুক খানা ধরে ফেললো, বললো বনহুর—মাদাম ওর কোন দোষ নেই, যা বলতে হয় আমাকে বলো?

তোমাকে আমি কিনতে চাই বুঝলে?

হাঁ বুঝেছি?

হুংমা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বনহুরকে—না, না আমি ওকে বিক্রি করবোনা। রাজা, কোন অলক্ষুণে মুহূর্তে আমি তোমাকে এখানে এনেছিলাম।

বনহুর বলে উঠে—হুংমা, তুমি যা চাও তাই পাবে কেনো তুমি আমাকে নিয়ে এতো

আমি কোন কথা শুনতে চাইনা রাজা। মিনা বাজারে বহু লোক আছে মাদাম তুমি রাজাকে ছাড়া যাকে খুশি নিয়ে যাও। আমার রাজাকে আমি বিক্রি করবো না।

হুংমা একথা বলায় আবার মাদামচীং তার দু'জন অনুচরকে ইংগিৎ করলো—হুংমাকে দড়ি দিয়ে বাধবার জন্য।

ওরা এগুতেই বনহুর বললো—আমার জন্য তোমরা ওকে কষ্ট দিওনা। কোন মূল্যও দিতে হবেনা আমার জন্য, চলো আমি যাচ্ছি।

হুংমা আকুলভাবে কেঁদে উঠলো—রাজা, এ তুমি কি করছো?

জানোনা রাজা—মাদামচীং কত বড়.....

বনহুর ওর মুখে হাত চাপা দেয়।

হুংমা কথা শেষ করতে পারবেনা।

মাদামচীং বলে—আমি তোমার সঙ্গিনীকে বিমুখ করবোনা। এক গাদা টাকা বের করে হুংমার দিকে বাড়িয়ে ধরে—এই নাও।

হুংমা টাকার গাদা হাতে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় মাদামের চোখে মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে মাদামচীং ক্ষুব্ধ সিংহীর ন্যায় গর্জে উঠে—ওকে বেঁধে নিয়ে চলো আমি কংঙ্গার মুখে নিক্ষেপ করবো।

ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠে হুংমার মুখমন্ডল। শিউরে উঠে ওর সমস্ত শরীর। বলে উঠে হুংমা—না না, আমাকে তোমরা ধরে নিয়ে যেওনা মাদাম.....আমাকে তোমরা ধরে নিয়ে যেওনা .....আমার বাবার আমি একমাত্র মেয়ে আমি না থাকলে বাবা মরে যাবে.....

মাদাম বললো—তবে টাকা তুলে নাও। যাও, বাড়ি ফিরে যাও। ঐ টাকা দিয়ে তোমরা চিরদিন বসে বসে খেতে পারবে।

হুংমা কংঙ্গার মুখে যাবার ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে টাকার গাদাগুলো তুলে নিলো তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে করুণ চোখে তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর ওর পিঠে হাত রেখে বললো—কিছু ভেবোনা হুংমা আবার দেখা হবে।

মাদামচীং তার অনুচরদের আদেশ দিলো বনহুরকে তার গাড়িতে তুলে নিতে।

দু'পাশে দু'জন ধরলো বনহুরকে।

বনহুর কোন প্রতিবাদ করলো না আপন ইচ্ছায় সে চেপে বসলো মাদামচীং এর গাড়িতে।

গাড়ি চলতে শুরু করলো।

হুংমা করুণ আঁখি মেলে তাকিয়ে রইলো—তার প্রিয় রাজার দিকে।

বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়েছে। হুংমার দিকে তাকিয়ে বড় ব্যাথা অনুভব করছিলো সে। চোখ দুটো নিজের অজান্তে ছল ছলে হয়ে এসেছিলো বনহুরের। বনহুর হাত তুলে ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

হুংমার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোটা ফোটা অশ্রু। রাজাকে নিয়ে খুব দুঃচিন্তায় ছিলো হুংমা কখন ওকে সে হারাবে যা সে ভয় পেয়েছিলো তাই হলো। হুংমার কাছ থেকে যাদুকর কন্যা মাদামচীং কেড়ে নিয়ে গেলো তার রাজাকে।

হুংমা টাকাগুলো ছুড়ে ফেলে দিলো তারপর ফিরে চললো সে হোটেল পিউলপাং এ।

হোটেলে প্রবেশ করেই ছুটে গেলো হুংমা রাজার ঘরে। ওর শূন্য বিছানায় পড়ে কাঁদলো সে অনেকক্ষণ।

হুংমার বাবা কান্নার শব্দ শুনে ছুটে এলো। হুংমাকে এভাবে কাঁদতে দেখে সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—কি হয়েছে হুংমা? হুংমা বলো কি হয়েছে? রাজা তোমাকে অপমান করেছে?

হুংমা পিতার কথায় মাথা তুলে তাকালো তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বাসিতভাবে কেঁদে উঠলো।

আজ হুংমার বাবা আদর না করে পারলো না। বললো—বল মা কেনো তুই কাঁদছিস?

বললো হুংমা—বাবা, রাজাকে মাদামচীং ধরে নিয়ে গেছে।

মাদামচীং রাজাকে ধরে নিয়ে গেছে?

হাঁ বাবা।

এবার হুংমার বাবার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, বললো—এ কি কথা বলছিস হুংমা?

যা সত্য তাই বলছি বাবা। আমি রাজাকে আজ জোর করে মিনা বাজারে নিয়ে গিয়েছিলাম। ও কোনদিন মিনা বাজার দেখেনি কিনা তাই। কে জানতো আজ মিনা বাজারে রাক্ষসী মাদামচীং আসবে। যদি জানতাম তাহলে এমন হতোনা। আজ আমি রাজাকে হারাতাম না......ফুপিয়ে কেঁদে উঠে হুংমা আবার।

চিহুয়াংচি কন্যার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—শুনেছিলাম মাদামচীং কারো কাছ থেকে কোন জিনিস নিলে তাকে প্রচুর টাকা-পয়সা দেয়? রাজার বিনিময় তোকে কিছু সে দেয়নি?
হাঁ, দিয়েছিলো প্রচুর টাকা।
প্রচুর টাকা।
হাঁ বাবা।
চিহুয়াংচির চোখ দুটো মুহূর্তে উজ্বল হয়ে উঠলো—কোথায়? কোথায় সে টাকা হুংমা?
আমি রাজাকে বিক্রি করে সে টাকা ঘরে আনবো এতো নীচ আমি নই।
হুংমা টাকা তুমি নাওনি।
নিয়েছিলাম।
কই সে টাকা?
ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি।
হুংমা! এতোগুলো টাকা তুমি ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসেছো বলোকি?
হাঁ বাবা। রাজার বিনিময় আমি টাকা নিতে পারবোনা। টাকা আমার কোন দরকার নাই।
হুংমা তোমার টাকা দরকার না থাকতে পারে। কিন্তু আমার আছে। কেনো তুমি টাকা নাওনি?
বলেছি আমার দরকার নাই।
হুংমা।
ভয় দেখিয়ে আমার মায়ের দ্বারা তুমি বহু টাকা রোজগার করেছো। আমাকেও তুমি বাধ্য করেছিলে টাকা রোজগারে কিন্তু আর নয়। আমি পারবো না তোমার হোটেলের খদ্দেরদের মন যোগাতে।
হুংমা আমাকে তুই ডোবাতে চাস?
ডোবাতে নয় বাবা—তোমাকে বাঁচাতে চাই। তুমি হোটেলের ব্যবসা ছেড়ে দাও।
খাবো কি তাহলে?
হাজার হাজার শ্রমিক কলকারখানায় কাজ করে পেটের অন্ন জোগাড় করছে তুমিও তাই করবে।
আর তুই—তুই কি করবি হুংমা?
আমিও তোমার সঙ্গে কলকারখানায় কাজ করবো। আমার শরীরে যথেষ্ট শক্তি আছে।
বেশ—তাই হবে, আমি আমার হোটেল নষ্ট করে ফেলবো কিন্তু মনে রেখো হুংমা তোমাকে আমি খেটে খাওয়াবো না।

বাবা আমি বড় হয়েছি বুঝতে, শিখেছি এখন আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবেনা। হুংমা কথাগুলো শেষ করে দ্রুত সিড়ি বেড়ে নিচে নেমে যায়।

❑

গাড়ির ঝাকুনিতে কেমন যেন মাথাটা ঝিমঝিম করছিলো বনহুরের। কতদিন কত রকম গাড়িতে সে চেপেছে কিন্তু কই কোনদিন তো তার এমন হয়নি। একটা কেমন সুমিষ্ট গন্ধ তার নাকে প্রবেশ করলো। অতি সাবধানেও বনহুর নিজকে সংযত রাখতে পারলোনা। ঢলে পড়লো সে গাড়িখানার মধ্যে।

যখন বনহুর চোখ মেললো তখন সে অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলো তাতে সে বিস্মিত হলো।

চারিদিকে সুউচ্চ দেয়াল। ছাদ নজরে পড়ছেনা—দেয়ালের মধ্য থেকে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। কক্ষ না গুহা বোঝা যাচ্ছে না। একপাশে বিরাট একটা মূর্তি। মূর্তির পাশে কয়েকটা নর-মুন্ড এবং নর কঙ্কাল পড়ে আছে। একটা পাত্রে কিছু তরল পদার্থ নজরে পড়লো বনহুরের।

ধীরে ধীরে উঠে বসলো বনহুর।

একটি কঠিন শয্যায় সে এতোক্ষণ শায়িত ছিলো। মাথার নিচে কোন বালিশ ছিলোনা। সম্পূর্ণ চীৎ হয়ে পড়েছিলো সে।

উঠে বসে তাকালো চারিদিকে—যে দৃশ্য তার নজরে পড়লো তা সত্যি বিস্ময়কর। বনহুর বুঝতে পারলো তাকে কোন যাদু গুহায় আটক রাখা হয়েছে। তার চার পাশে নানা রকম যাদু বিদ্যার সরঞ্জাম ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মনে পড়লো বনহুরের প্রথম যখন তাকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হলো।

গাড়ি তো নয় যেন দোলনা।

বনহুরকে ওরা পিছন অংশে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলো। বনহুর কোন প্রতিবাদ করেনি কারণ চীন যাদু সম্রাট হুয়াংচুকে তারও যে প্রয়োজন। চিংচুর দ্বারা যে কাজ সে সমাধা করবে ভেবেছিলো সে সুযোগ তার আপনা আপনি এসে গেলো। হয়তো তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, নয় তার ভাগ্যে কোন কঠিন বিপদের সম্ভাবনা আছে। যা থাকে তার অদৃষ্টে তাই হবে। এমন একটা মুহূর্তে বনহুর বিনষ্ট করতে পারবেনা। তাই বনহুর কতকটা ইচ্ছা করেই চীন যাদুকরী মাদাচীং এর কাছে নিজকে সমর্পণ করেছিলো।

গাড়িতে বসে তাকিয়ে ছিলো বনহুর যতক্ষণ হুংমাকে দেখা যাচ্ছিলো ততক্ষণ সে নির্ণিমেষ নয়নে দেখছিলো ওকে। হুংমার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোটা ফোটা অশ্রু। হুংমা ওর দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। বনহুর ও হৃদয়ের ব্যথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছিলো। নিজের অলক্ষ্যে তার চোখ দুটোও ঝাপসা হয়ে আসছিলো, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলো তখন বনহুর।

বনহুর যতই নিজকে হুংমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করুক না কেনো তবু মন তার নিজের অজান্তে কখন হুংমাকে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছিলো। একটা গভীর মায়া জমে উঠে ছিলো, তার সে নিজেও তা উপলব্ধি করতে পারেনি। হঠাৎ হুংমাকে ছেড়ে এ ভাবে চলে যেতে মন তার ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলো।

হুংমার চেহারাটা ক্রমেই ঝাপসা হয়ে এক সময় মিশে গেলো দূরত্বের ব্যবধানে। বনহুর এবার ফিরে তাকালো মাদামচীং এর দিকে। হরিণীর মত দুটি ডাগর ডাগর চোখ তারই দিকে স্থির হয়ে আছে।

বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলোনা। তার চোখ দুটো যেন নিস্পলক হয়ে গেছে—আড়ষ্ট হয়ে গেছে একেবারে।

একি বনহুরের মাথাটা যেন কেমন ঝিম ঝিম করে উঠলো, হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়লো সে গাড়ি খানার মধ্যে তারপর আর কিছু মনে নেই। এখন সে কোথায় এটা কোন কক্ষ না গুহা তাও বুঝতে পারছেনা।

অন্য যে কোন ব্যক্তি হলে ভীত হয়ে পড়তো কিন্তু ভয় পাবার লোক নয়। বনহুর একটা অদম্য জানার বাসনা তাকে অসীম সাহসী করে তুলেছে।

অত্যন্ত পিপাসা বোধ করলো বনহুর গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কতমাস বা ক'দিন যে সে এমন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলো জানেনা। উঠে দাঁড়ালো বনহুর, মাথাটা এখনও কেমন ঝিম ঝিম করছে। বার বার দু'টো চোখ উঠছে তার মনের পর্দায়। কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে দুটি চোখে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

পা দু'খানা তার টলছে।

ধীরে ধীরে এগুতে লাগলো বনহুর ওদিকের মূর্তিটার দিকে। ভাল করে তাকাতেই দেখলো সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক নারী মূর্তি।

বনহুরের দৃষ্টি ধীরে ধীরে নত হয়ে এলো। তবু আর একবার সে তাকিয়ে দেখলো মূর্তিটা। নর মুন্ডগুলো তাকে দেখে যেন দাঁত বের করে হাসছে। বনহুর তার শূন্য বিছানার দিকে তাকালো, ঐ বিছানাটা যেন তার অতি আপনা জন বলে মনে হলো।

বনহুর ফিরে চললো বিছানার দিকে।

দু'পা এগুতেই হোচট খেলো সে। পায়ের নিচে ছড়িয়ে আছে একটা নর কঙ্কাল। বনহুর পড়তে পড়তে টাল সামলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সম্মুখে তাকাতেই দেখতে পেলো কয়েকটা সাপের মূর্তি দেয়ালের সঙ্গে আটকানো রয়েছে। সাপের মূর্তিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

লালচে অগ্নি বর্ণ একটা আলোকরশ্মি জমাট অন্ধকার ঘরখানাকে যেন আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছিলো। মূর্তিগুলো যেন এক একটা জীবন্ত রাক্ষস। এই মুহূর্তে ওরা যেন গ্রাস করবে তাকে।

বিরাট কক্ষ বা গুহাটার মধ্যে বনহুর যেন একটি লিলিপুট। অত্যন্ত পিপাসায় গলাটা শুকিয়ে গেছে। বার বার সে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দু'খানা চেটে ভিজিয়ে নিচ্ছিলো। তবু সে হতাশ হয়নি দেখবে যাদুকর হুয়াংচুক, দেখবে তার যাদু বিদ্যা। বনহুর যাদু বিদ্যা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করেনা সে মানুষের দৈহিক বলকে।

বনহুর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না সে ফিরে এলো তার বিছানার পাশে। এতোক্ষণ সে নজর করেনি, ভালভাবে তাকাতেই দেখলো যে বিছানায় সে শুয়ে ছিলো এতোক্ষণ সে বিছানাটা সত্যি সত্যি কোন বিছানা নয় কতগুলো মৃত দেহের উপর মোটা চামড়া বিছিয়ে বিছানা তৈরি করা হয়েছে। শিউরে না উঠলেও আঁতকে উঠলো বনহুর। কলা গাছের গুড়ি দিয়ে যেমন ভেলা তৈরি করা হয় তেমনি কতকগুলো শবদেহ দিয়ে একটা ভেলার মত তৈরি করা হয়েছে তারই উপরে বিছানা পাতা রয়েছে। বসার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো বনহুর কেমন যেন একটা বিদঘুটে গন্ধ লাগছে তার নাকে।

❑

ফাংফা চিৎকার করে বললো—চিংচু তুমি এসব কি বলছো?

হাঁ আমি তোমার সঙ্গে চীনের প্রাচীর দুর্গে দস্যু হামবার্টের গুহায় যাইনি।

মিথ্যে কথা বলতে তোমার এতোটুকু ভয় হচ্ছে না? তুমি হামবার্টকে কথা দিয়ে আসোনি? তার কাছ থেকে টাকা নাওনি?

না, আমি হামবার্টের কাছে যাইনি টাকাও আমি নেইনি।

আমি নিজে তোমাকে নিয়ে গেছি আর তুমি একেবারে আমার কাছে অস্বীকার করে বসলে চিংচু? জানো কার সঙ্গে কথা বলছো?

চিংচু সোজা বলে বসে—যা সত্যি আমি তাই বলছি। আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাইনি।

আবার সেই কথা? চলো তোমাকে নিয়ে যাবো।

কোথায়? আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে ফাংফা রাজ?

চীন দস্যু সম্রাটের কাছে।

না না আমি তার কাছে যাবোনা।

সেদিন তো কোন আপত্তি করোনি চিংচু। আজ কেনো এতো আপত্তি করছো তুমি?

আমি তোমার কোন কথা ঠিক্ বুঝতে পারছিনা ফাংফা রাজ? মাথায় কিছু ঢুকছেনা। সব যেন কেমন এলো মেলো হয়ে যাচ্ছে। এদিকে আমার বন্ধু রাজা হারিয়ে গেছে, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে....সর্বনাশ হয়ে গেছে ফাংফা রাজ.....

কোন কথা শুনতে চাইনা তুমি দস্যু হামবার্টের কাছ থেকে যে টাকা নিয়ে এসেছো তা তাকে নিজে গিয়ে ফেরৎ দিয়ে এসো। আর বলে এসো আমি আপনার এখানে আসিনি, চলো। ফাংফা তার দু'জন অনুচরকে আদেশ দিলো—ওকে হাত পা বেঁধে গাড়ির মধ্যে তুলে নাও।

মালিকের আদেশ পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ফাংফার সঙ্গীরা চিংচুকে তুলে নিলো।

চিংচুর অবস্থা হলো সঙ্কটাপূর্ণ সে অস্থিরভাবে কান্না কাটা শুরু করে দিলো।

ফাংফা কোন কথা শুনলোনা চিংচুকে নিয়ে চললো চীনের প্রাচীরের মধ্যে হামবার্টের গুহায়।

সেই আলোক স্তম্ভের কাছে এসে থামলো গাড়িখানা। নির্জন প্রান্তরের গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো ফাংফা, সঙ্গীদের নির্দেশদিলো চিংচুকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিতে।

চিংচুর অবস্থা করুন, সে ভীত আতঙ্কিত বার বার সে ফাংফার হাত পা ধরে অনুরোধ জানাচ্ছিলো তবু ফাংফা কৌশলে ওকে লাইট পোষ্টের অভ্যন্তরে নিয়ে এলো তারপর নিয়ে চললো হামবার্টের নিকটে।

চিংচুর চোখে বিস্ময় ভয়, তাকে এক রকম টেনেই নিয়ে চললো ফাংফা।

চলতে চলতে বার বার চিংচু হোচট্ খাচ্ছিলো, কখনও বা দেওয়ালে মাথা ঠুকে যাচ্ছিলো।

লিফট পর্যন্ত টেনে হিছড়ে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছিলো ফাংফা ওকে লিফটের উপর, নিজেও সে চেপে দাঁড়ালো। অমনি লিফট্খানা সাঁ সাঁ বেগে ধাবিত হলো সোজা দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে।

চিংচু আড়ষ্ট হয়ে গেলো একেবারে। এমন সে জীবনে দেখেনি, কাজেই আড়ষ্ট হবার কথাই বটে।

মাত্র কয়েক মিনিটেই চিংচু সহ ফাংফা পৌছে গেলো হামবার্টের সম্মুখে। হামবার্ট তার সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট।

ফাংফা হামবার্ট কে অভিবাদন জানিয়ে বললো—সম্রাট একে ধরে এনেছি।

হামবার্ট গর্জন করে উঠলো—চিংচু তুমি কি আমার সব কথা ভুলে গেছো? ভুলে গেছো তোমার পরিণতির কথা?

চিংচু কোন দিন হামবার্টকে দেখেনি।

হামবার্টের ভীষণ চেহারা দেখে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে চিংচু।

হামবার্ট রাগে উঠে দাঁড়ায়।

এক পা তার-খাটো, এক চক্ষু তার অন্ধ, সমস্ত মুখে বসন্তের গভীর দাগ, ভয়ঙ্কর লাগছে ওকে। চিংচু দু'চোখ কপালে তুলে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যায় ভূতলে।

হামবার্ট বিকট চিৎকার করে বলে—তোমার চাচা হুয়াংচুকে আমার দরবারে হাজির করবে বলে কথা দিয়ে গেলে অথচ তার পর কদিন হলো খেয়াল ছিলোনা তোমার? টাকাও নিয়েছো অথচ নিশ্চিন্ত বসেছিলে কেমন?

মালিক আপনি বিশ্বাস করুণ আমি কোনদিন আপনার সম্মুখে আসিনি বা আপনার কাছে টাকা নেই নাই......কম্পিত কণ্ঠে কথাগুলো বললো চিংচু।

কিন্তু কে শোনে চিংচুর কথা।

হামবার্ট উঁবু হয়ে চিংচুর চুল ধরে টেনে তোলে তারপর প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দেয় ওর নাকের উপর। চিংচুর নাক দিয়ে দর দর করে গড়িয়ে পড়ে রক্তের ধারা।

হামবার্ট পুনরায় গর্জে উঠে—এমন মিথ্যা কথা বলতে সাহস হলো তোমার? ফাংফা এর জন্য তোমাকেও শাস্তি পেতে হবে।

ফাংফা অভিবাদন জানিয়ে বললো—আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ সম্রাট বাহাদুর।

চিংচু মিথ্যা বলার জন্য তুমিও অপরাধি কারণ চিংচু তোমার পরিচিত আমার নয়।

কিছু বুঝতে না পেরে চিংচু হাঁউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে। উঁবু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে চিংচু হামবার্টের পা।

সঙ্গে সঙ্গে হামবার্ট এক লাথি দেয় চিংচুর চোয়ালে। চোয়াল থেকে মাংস উঠে যায়, হাড় বেরিয়ে পড়ে বুটের আঘাতে। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় চিংচু মেঝের উপর। হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু পারেনা।

হামবার্ট পুনরায় বুট দিয়ে ওকে চীৎ করে ফেলে দেয় মেঝেতে তারপর একখানা পা তুলে চেপে ধরে ওর গলাটা। জোরে চাপ দেয় কঠিনভাবে।

একটা গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে আসে চিংচুর মুখ থেকে তারপর গড় গড় করে গড়িয়ে পড়ে খানিকটা তাজা রক্ত গাল বেয়ে। চোখ দুটো বেরিয়ে আসে মাংসের ভিতর থেকে। চিংচুর জীবন লীলা সাঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

ফাংফার দেহটা তখন বেতস পত্রের ন্যায় থর থর করে কাপছে। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার মুখ মন্ডল, সে বুঝতে পারছে এবার তার পালা।

হ্যমবার্ট শার্দ্দুলের মত পা পা করে এগুয়ে ফাংফার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

বজ্র মুষ্টিতে চেপে ধরলো ওর গলার কাছের জামাটা। এক হেঁচকা টান মেরে টেনে নিলো খানিকটা সম্মুখে তারপর ডান হাতে নিজের কোমরের বেল্ট থেকে ছোরাটা খুলে নিয়ে বসিয়ে দিতে গেলো ওর তল পেটে।

ঐ মুহূর্তে বলে উঠলো ফাংফা—আমাকে মারবেন না মালিক আমি বুঝতে পেরেছি সব কিছু। চিংচুর কোন দোষ ছিলোনা......

চিংচুর দোষ ছিলোনা বলোকি?

হাঁ মালিক দোষ আমার কারণ চিংচু এখানে আসেনি আমার চোখে ধোকা দিয়ে এসেছিলো অন্য কেউ।

ফাংফা!

সম্রাট আমাকে মাফ করে দিন, আমি সেই শয়তানটাকে ধরে নিয়ে আসবো, হাজির করবো আপনার সামনে।

কে সে শয়তান যে চিংচু বেশে আমার দুর্গে প্রবেশ করতে সাহসী হয়? কে সে?

মালিক সম্রাট......সে পিউলপাং হোটেলের একজন খদ্দের।

ফাংফা—বলোকি?

হাঁ মালিক, আমার সন্দেহ হচ্ছে সে ছাড়া অন্য কেউ নয়। চিংচুর ছদ্মবেশে রাজাই এসেছিলো কারণ আজ বেশি স্পষ্ট মনে হচ্ছে সেদিন যে চোখ দুটো দেখেছিলাম সে চোখ চিংচুর চোখ বলে মনে হয়নি।

তবু তুমি তাকে নিয়ে এসেছিলো আমার দুর্গে? এতোবড় সাহস তোমার......ছোরাখানা উদ্যত করে ধরে—এই মুহূর্তে তোমাকে খুন করবো।

মালিক আমাকে খুন করলে আসল শয়তানটাকে সাজা দেওয়া হবেনা। আমি সেই লোকটাকে নিয়ে আসতে চাই আপনার সম্মুখে। আপনি তাকে নিজের হাতে সাজা দিবেন মালিক। আমাকে খুন করে আসল দোষীকে হাত ছাড়া করবেন না।

চোখ দেখেই যদি তোমার সেদিন সন্দেহ হলো তাহলে তুমি তাকে নিয়ে এলে কেন? তাছাড়া তুমি তার ছদ্মবেশ খুলে ফেললে না কেন?

সেজন্যই তো ক্ষমা চাইছি মালিক। আমার সন্দেহ হলেও তেমন কিছু মনে হয়নি মানে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখিনি।

বুঝেছি তোমার অবহেলাই এ সর্বনাশের মূল। আমি যদি একদিন চিংচুকে দেখতাম তাহলে সে আমার চোখে ধূলো দিতে পারতো না। চিংচুকে চিনতেও আমার ভুল হতো না। কে সে সুচতুর ধূর্ত যে চিংচুর বেশে আমার চোখে ফাঁকি দিয়ে আমার দুর্গে প্রবেশ করেছিলো। যাও তাকে আমার সম্মুখে হাজির করো। যদি তাকে না আনতে পার তাহলে মৃত্যু তোমার অনিবার্য মনে রেখো। যাও—যাও ফাংফা।

ফাংফা কুর্ণিশ জানিয়ে পিছু হটে বেরিয়ে যায়।

হামবার্ট তার খোঁড়া পা দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় পায়চারী করে চলে।

ফাংফা শুরু করে রাজার সন্ধান।

জিহাংহার প্রতিটি রাস্তা প্রতিটি গলি প্রতিটি দোকান হোটেল, সিনেমা হল সন্ধান করে ফেরে সে রাজার খোঁজে।

কখনও হেটে, কখনও গাড়িতে, কখনও এক্কায় চেপে কিন্তু রাজাকে খুঁজে আর পায়না।

রাজা তখন যাদুকর কন্যা মাদামচীং এর যাদু কক্ষে বন্দী।

চারিদিকে তার যাদুর প্রাচীর।

সমস্ত দেয়ালে যাদুর মূর্তি।

বনহুর যাদু বিশ্বাস করতো না। যাদুর মায়াজালে সে একবার জড়িয়ে পড়েছিলো কিন্তু এমন ধরণের যাদুর প্রাচীরে আবদ্ধ হয়নি।

চারিদিকে শুধু যাদু আর যাদু।

পিপাসায় কণ্ঠ তার শুকিয়ে আসছে। মাথাটা এখনও ঝিম ঝিম করছে।

একটা অদ্ভুত শব্দ তার কানে আসছে যেন।

বনহুর শবদেহগুলোর দিতে তাকিয়ে পিছু হটতে লাগলো।

দেওয়ালের সাপগুলো যেন ফোঁস ফোঁস শব্দ করেছে।

অদ্ভুত সেই জীবটার মূর্তির চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

বনহুর তাকালো উপরের দিকে।

শুধু জমাট অন্ধকার।

হঠাৎ শিউরে উঠলো বনহুর ছাদের অন্ধকারে কতকগুলো মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দোল খাচ্ছে। স্পষ্ট দেখা না গেলেও অস্পষ্ট ভাবে বোঝা গেলো। একটি নয় বেশ কয়েকটা মৃত দেহ মৃদু মৃদু দুলছে।

দুর্দ্ধান্ত দুঃসাহসী বনহুরের ললাটে ফুটে উঠলো বিন্দু বিন্দু ঘাম।

হঠাৎ দু'খানা হাত ঝাপসা অন্ধকারে এগিয়ে এলো তার সামনে।

চোখ রগড়ে তাকালো বনহুর এ হাত দু'খানা কার।

কিন্তু কোন দেহ নজরে পড়ছেনা।

হাত দু'খানা কোন নারীর তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ হাতে মোটা বালা নজরে পড়লো। একটি পাত্র রয়েছে পাত্রে হয়তো বা পানি।

বনহুর তৃষ্ণার্ত, তাই সে দু'হাত বাড়িয়ে পানি পাত্র ধরতে গেলো। কিন্তু একি কোথায় সেই হাত বা পানি পাত্র। সব মিশে গেছে ঝাপসা অন্ধকারে।

বনহুর ফিরে তাকালো পিছনে।

সঙ্গে সঙ্গে নারী কণ্ঠের অদ্ভুত হাস্যির শব্দ।

বনহুর দু'চোখ বিস্ফারিত করে তাকালো। তবে কি ঐ ঝুলন্ত মৃত দেহগুলো তার অবস্থা দেখে হাসছে। দেয়ালের মধ্য থেকে যে আলোক রশ্নির আভা গুহা বা কক্ষটার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে সেই আলোক রশ্নিতে বনহুরের সুন্দর মুখমন্ডলে ফোঁটা ফোঁটা ঘামগুলোকে এক একটা মুক্তা বিন্দুর মত মনে হচ্ছিলো।

মাঝে মাঝে বনহুর হাতের পিঠে কপালের ঘামগুলো মুছে ফেলেছিলো।

বনহুর কোনদিন ভয় পায়নি বা ঘাবড়ে যায়নি। সে জীবনে বহু অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। যে সাগর তলে সাধারণ মানুষের প্রবেশ অসাধ্য সেই গভীর সাগর তলে সে বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করেছে। একবার বনহুর গভীর খাদের মধ্যে ভীষণ স্রোত ধারার তলদেশে ডুবরীর পোশাকে প্রবেশ করেছিলো মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে ভয় পায়নি। তার চরম শত্রু ছেদন করে দিয়েছিলো পাইপ রশি। ভয়ঙ্কর স্রোতের টানে তলিয়ে গিয়েছিলো, হারিয়ে গিয়েছিলো বনহুর কোন অজানায়। ভাগ্য ভাল ছিলো তাই সে জীবনে বেঁচে গিয়েছিলো নিশ্চিত মৃত্যু থেকে।

এমনি কত ভয়াবহ অবস্থায় পড়েছে বনহুর কিন্তু কোনদিন সে বিচলিত হয়নি বা ঘাবড়ে যায়নি। আজ সে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এমন অদ্ভুত কান্ড সে কোনদিন দেখেনি। বিশ্বাস করেনি বনহুর কোন দিন যাদু বলে কোন কিছু আছে।

একবার সে তার বাপুর মুখে একটা গল্প শুনেছিলো। আজও সেই কাহিনীটা বনহুরের কাছে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে মনে হয়। সেদিন বনহুর দস্যুতায় যায়নি তাজের পাশে বসে সে ওকে ঘাস খাওয়াচ্ছিলো কালু খা এসে বসে তার কাছে।

ফিরে তাকায় বনহুর—বাপু তুমি!

আজ বাহিরে যাসনি হুর?

তুমি তো যেতে বারণ করেছো?

হাঁ আমিই বারণ করেছি বনহুর কিন্তু কেনো করেছি জানিস?

তা কেমন করে জানবো? তুমি বললে তো জানবো?

কালু খাঁর চোখ দুটোতে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছিলো, বলেছিলো—আজ একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি তাই তোকে যেতে দেইনি।

কালু খার কথায় বিস্মিত কণ্ঠে বলেছিলো সেদিন বনহুর—বাপু তুমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখছো তাই আমাকে আমার কাজে যেতে বাধা দিলে? আমি মনে করেছিলাম আর কিছু।

অবহেলা করিসনা বনহুর, স্বপ্ন কোনদিন মিথ্যা হয়না। তবে সব স্বপ্ন নয়, যে স্বপ্ন রাত্রির শেষ ভাগে দেখা যায় সেই স্বপ্ন কতকটা ফলে।

বনহুর জিজ্ঞাসা করছিলো সেদিন—কি স্বপ্ন তুমি আজ রাত্রির শেষ ভাগে দেখেছো বাপু?

বলেছিলো কালু খাঁ—জানি তুই বিশ্বাস করবিনা। আমিও করতাম না একদিন। হুর আজ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম তুই বেশ কোন এক যাদুকরের যাদু পুরীতে আটকা পড়ে গেছিস। চারিদিকে শুধু যাদুর কারসাজি সে এক ভয়ঙ্কর স্থান। আমি দূর থেকে তোকে দেখছি কিন্তু কিছু করতে পারছিনা। ধীরে ধীরে আমি কোন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেলাম আর তোকে দেখতে পাচ্ছিনা শুধু তোর আর্তচীৎকার শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ আমার ঘুম ভেংগে গেলো, সমস্ত দেহ আমার ঘামে ভিজে চুপষে গেছে। আমি বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

সেই কারণে তুমি আজ আমাকে বাইরে যেতে দিলেনা বাপু?

হাঁ বড় খারাপ স্বপ্ন এটা।

বনহুর কালু খাঁর কথায়, সেদিন হো হো করে হেসে উঠেছিলো।

গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলো কালু খা—তুই যাদু বিশ্বাস করিসনা বনহুর কিন্তু আমি করি।

বাপু তুমি এতোবড় বিখ্যাত দস্যু হয়ে যাদু বিশ্বাস করো? সত্যি আমি অবাক না হয়ে পারছিনা।

শোন বনহুর, কেনো যাদু বিশ্বাস করি তোকে বলছি।

বলেছিলো বনহুর—বেশ বলো শুনি।

সে এক অদ্ভুত কাহিনী......বনহুরের মুখ থেকে দৃষ্টি চলে গেলো কালু খাঁর মুক্ত জানালা দিয়ে গুহার বাহিরে। বলতে শুরু করলো কালু খাঁ—আমি তখন কোথাও চাকরী বা কাজ না পেয়ে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাবা মারা গিয়েছিলো ছোট বেলায়, মা ছিলো সেও মারা গেলো বিনা ঔষধে। মাকে কবর দিয়ে আর বাড়ি মুখো হতে পারলাম না। একটা প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো আমার মনে। কেনো আমি কি এই পৃথিবীর একজন নই। একদল আছে যারা পৃথিবীর বুকে জন্মলাভ করে সোনার চামচ মুখে করে। আর একদল আছে যারা ডাষ্টবিনের পচাঁ চামচ মুখে করে। আর

একদল আছে যারা ডাষ্টবিনের পঁচা নিকৃষ্ট আহার কুড়িয়ে তিল তিল করে বেড়ে উঠে। বনহুর আমার মনে যে আগুন জ্বললো তা ঐ সোনার চামচ মুখে করে যারা জন্মায় তাদের বিরুদ্ধে......সব তো তোকে বলেছি একদিন।

হাঁ বাপু সে সব কথা মনে আছে আমার।

আমি সভ্য জগতে স্থান না পেয়ে দস্যু জীবন বেছে নিলাম। যে ব্রত তোকেও বেছে নিতে বাধ্য করেছি আমি। হাঁ কি যেন বলছিলাম?

এরি মধ্যে সব ভুলে গেলে বাপু?

বনহুর সব ভুলে যাই আমি যখন আমার অতীত জীবনের কথা মনে করি। আমি তখন হারিয়ে যাই পৃথিবীর সেই দুঃস্থ অসহায় নোংরা মানুষগুলোর মধ্যে। কি বলছিলাম? বলছিলাম যখন আমি সবেমাত্র দস্যুতা শুরু করেছি, তখন একদিন এক নৌকায় হানা দিলাম আমি আর আমার দু'জন সহচর। ওরা বাইরে মাঝি মাল্লাদের উপর হামলা চালালো, আমি প্রবেশ করলাম নৌকাখানার ভিতরে। বনহুর তুই বিশ্বাস করবিনা তবু আমি বলবো।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো কালু খাঁ—ভেবেছিলাম নৌকার মধ্যে প্রচুর ধন সম্পদ আর ঐশ্বর্য পাবো কিন্তু যা দেখলাম অদ্ভুত সে দৃশ্য। একটি জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধা নৌকার মধ্যে শায়ীত। চোখ দুটো ওর কোঠরাগত। মাথায় দু' এক গাদা চুল আছে তাও একেবারে সাদা ধপধপে? মুখে দাঁত নেই শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে পোড়া বেগুনের মত লোকটা ধুকছে তার পাশে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী। প্রথমে আশ্চর্য হলাম পরে জিজ্ঞাসা করলাম—টাকা পয়সা কি আছে বের করো। হাঁ আর একটি কথা বলতে ভুলে গেছি, আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে জানিয়ে ছিলো ঐ নৌকায় প্রচুর ধন সম্পদ যাচ্ছে। কিন্তু হানা দিয়ে দেখলাম সম্পূর্ণ মিথ্যা। রাগে শরীর আমার গস গস করে উঠলো। তবু বললাম, কি আছে বের করো। বৃদ্ধা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে বললো—আমার সঙ্গে ধন-সম্পদ কিছু নাই শুধু আছে আমার স্ত্রী...বৃদ্ধের কথায় চমকে উঠলাম ভীষণভাবে। কবরে যার এক পা চলে গেছে তারই স্ত্রী কিনা এক তরুণী। তরুণীর বয়স ষোল বছরের বেশি নয়। চেহারা অতি সুন্দর। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ তারপর বললাম—তুমি যমের বাড়ি গিয়ে বসে আছো আর তোমার এই স্ত্রী? বৃদ্ধা বললো—হাঁ অনেক সখ করে বিয়ে করেছি। যদি ওকে নাও নিয়ে যেতে পারো। তবু আমাকে জীবনে মেরোনা। অনেক আশা আকাঙ্খা আছে, এ পৃথিবীর অনেক কাজ এখনও আমার বাকি ......বৃদ্ধের কথা শুনে হাসবো না কাঁদবো ভেবে ঠিক পেলামনা, তবু অনেক কষ্টে হাসি দমন করে

বললাম—তোমার বৌকে আমরা নিয়ে কি করবো কিন্তু মনে রেখো বাড়ি গিয়ে যদি একে তালাক না দাও তাহলে তোমার জীবন আমরা সংহার করবো। বৃদ্ধ বলে উঠলো—কেনো কেনো সংহার করবে তোমরা আমার এ অমূল্য জীবন? আমি বললাম—সে কথাও পরে ঐ দিন জানতে পারবে যেদিন তোমাকে আমরা পরপারে পাঠাবো। বেশি সময় নষ্ট না করে আমরা নৌকা থেকে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ পিছনে একটা বিকট অট্টহাসির শব্দ শুনতে পেলাম, ফিরে তাকিয়ে দেখি নৌকাখানার মধ্যে বৃদ্ধ নেই এক ভয়ঙ্কর চেহারার বলিষ্ঠ লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে ঐ লোকটা আমাকে ফিরে তাকাতে দেখেই বললো—যা বেঁচে গেলি ভাগ্যিস সুন্দরীর মোহ তোকে আকৃষ্ট করেনি......

এরপর আমরা কি ভাবে যে ঐ নৌকা থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তীরের দিকে সাঁতরে এলাম জানিনা। তারপর আর কোনদিন এমন ঘটনা ঘটেনি আমার জীবনে। পরে জানতে পেরেছিলাম ঐ নৌকাখানা কোন এক যাদুকরের ছিলো।

কালু খার কথাগুলো সেদিন বনহুরের কাছে একটা আজগুবি গল্প বলে মনে হয়েছিলো আজ বনহুর বুঝতে পারে যাদু বলে কোন একটা জিনিস আছে যা সম্পূর্ণ আজগুবি নয়। বনহুরের মনে কালু খার কথাগুলো আজ একবার বিদ্যুৎ গতিতে প্রবাহিত হয়ে চললো। বনহুর আজ নিজে যাদুর আবেষ্টনীতে আটকা পড়ে গেছে। হঠাৎ ফিরে তাকালো বনহুর—অগ্নিময় লালচে আলোতে বিস্ময় নিয়ে দেখলো একটা নগ্ন দেহ নারী মন্থর পদক্ষেপে তার দিকে এগিয়ে আসছে—চিনতে বাকি রইলোনা নারী অন্য কেহ নয় চীন যাদুকরের মেয়ে মাদামচীং। দু'চোখে তার নেশা।